হযরত ইমাম গাযযালী (র)

সৌভাগ্যের পরশমণি

চতুর্থ খণ্ড ঃ পরিত্রাণ

আবদুল খালেক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অভিমত

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গায্‌যালী (র) ছিলেন ইসলাম জগতের অদ্বিতীয় আলিম ও অসামান্য খোদাপ্রেমিক ওলী। তাঁর রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'কিমিয়ায়ে সা'আদাত' অন্যতম। এই গ্রন্থখানি তীরকতপন্থীদের পথপ্রদর্শক। ইহাতে আছে মানসিক রোগসমূহের সম্যক পরিচয় এবং উহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণের প্রকৃষ্ট উপায়। অবশ্য এই ব্যাপারে কামিল-মুরশিদের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

গ্রন্থখানি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া খোদাপ্রেমিক ও জ্ঞানানুরাগীদের পিপাসা মিটাইয়া আসিতেছে। বাংলা ভাষায়ও ইহার অভ্রান্ত অনুবাদ প্রকাশের তীব্র অভাব অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। প্রিয় বন্ধু মৌলভী আবদুল খালেক বি.এ. (অনার্স) সাহেব বাংলা ভাষাভাষীদের এই অভাব পূরণে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

দোয়া করি, এই অনুবাদ গ্রন্থ 'সৌভাগ্যের পরশমণি' আল্লাহর দরবারে কবূল হউক এবং গ্রন্থকার ও অনুবাদকের পরিশ্রম ও নেক উদ্দেশ্য সফল হউক। আমীন!

আহ্‌কার
আবদুল ওহ্‌হাব
মুহ্‌তামিম
হুসাইনিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা
বড়কাটরা, ঢাকা

সূচিপত্র

সূচনা	৯
পরিত্রাণ খণ্ডের বর্ণিত বিষয়	৯
প্রথম অধ্যায়	
তওবা	১০-৪২
দ্বিতীয় অধ্যায়	
ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা	৪৩-৯৬
তৃতীয় অধ্যায়	
ভয় ও আশা	৯৭-১৩৭
চতুর্থ অধ্যায়	
অভাবগ্রস্ততা ও সংসার-বিরাগ	১৩৮-১৮০
পঞ্চম অধ্যায়	
নিয়ত, সিদ্‌ক ও ইখ্‌লাস	১৮১-২১৭
ষষ্ঠ অধ্যায়	
মুহাসাবা ও মুরাকাবা	২১৮-২৪৬
সপ্তম অধ্যায়	
সাধু-চিন্তা	২৪৭-২৮১
অষ্টম অধ্যায়	
তাওক্কুল	২৮২-৩৩৫
নবম অধ্যায়	
মহব্বত, অনুরাগ ও সন্তোষ	৩৩৬-৩৯০
দশম অধ্যায়	
মৃত্যু-চিন্তা	৩৯১-৪২২
উপসংহার	৪২৩

সৌভাগ্যের পরশমণি

চতুর্থ খণ্ড ঃ পরিত্রাণ

সূচনা

যে সকল গুণ লাভ করিলে মানব নাজাত (পরিত্রাণ) পাইতে পারে তৎসমুদয় এই খণ্ডে বর্ণিত হইবে এবং দশটি অধ্যায়ে ইহা সমাপ্ত হইবে। যথা ঃ

প্রথম অধ্যায়— তওবা (অনুতাপের সহিত আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন)।

দ্বিতীয় অধ্যায়— ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা।

তৃতীয় অধ্যায়— ভয় ও আশা।

চতুর্থ অধ্যায়— দরিদ্রতা ও সংসারের প্রতি উদাসীনতা।

পঞ্চম অধ্যায়— নিয়্যত (সংকল্প), ইখলাস (ইবাদতে বিশুদ্ধতা) এবং সিদ্‌ক (সততা)।

ষষ্ঠ অধ্যায়— মুহাসাবা (প্রবৃত্তির হিসাব গ্রহণ) ও মুরাকাবা (প্রবৃত্তির প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা)।

সপ্তম অধ্যায়— তাফাক্কুর (সৎচিন্তা করা)।

অষ্টম অধ্যায়— তাওয়াক্কুল (আল্লাহ্‌র উপর ভরসা) ও তাওহীদ।

নবম অধ্যায়— মহব্বত, শওক (অনুরাগ) ও রিযা (প্রসন্নতা)।

দশম অধ্যায়— মৃত্যু-স্মরণ ও পরকালের অবস্থা।

প্রথম অধ্যায়

তওবা

ধর্মপথ-যাত্রীদের প্রথম ধাপ–প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, তওবা (অনুতাপের সহিত আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন) মুরীদগণের সর্বপ্রথম পদ-বিক্ষেপ এবং ধর্মপথ-যাত্রীদের যাত্রা আরম্ভ। তওবা ব্যতীত মানবের অন্য কোন গতি নাই। কারণ, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নিষ্পাপ থাকা একমাত্র ফিরিশতাগণের পক্ষেই সম্ভবপর। অপরপক্ষে চিরকাল পাপে ডুবিয়া থাকা শয়তানের কার্য। গুনাহ্‌র কাজ পরিত্যাগপূর্বক অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম ও তদীয় সন্তান মানবগণের কার্য। যে-ব্যক্তি কৃত গুনাহ হইতে তওবা করিয়াছে, সে হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের সহিত নিজের সম্বন্ধ ঠিকভাবে পাতিয়াছে। আর যে ব্যক্তি চিরজীবন পাপকার্যে অতিবাহিত করিল, সে শয়তানের সঙ্গে স্বীয় সম্বন্ধ দৃঢ় করিয়া লইল।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত কেবল ইবাদতে লিপ্ত থাকা মানবের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কেননা, সে বুদ্ধিহীন ও অপূর্ণ অবস্থায় জন্মলাভ করে এবং সর্বপ্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা মানব-হৃদয়ে শয়তানের অস্ত্ররূপ লোভ-লালসা সংযোগ করিয়া দিয়া থাকেন। মানব মনে অভিলাষ-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিবার পর বুদ্ধি-বৃত্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। বুদ্ধি অভিলাষ-প্রবৃত্তির দুশমন এবং ফিরিশতাগণের মৌলিক নূরের সমজাতীয়। কিন্তু বুদ্ধির বহু পূর্বে মানব মনে অভিলাষ-প্রবৃত্তি জন্মলাভ করিয়াছে বলিয়া সে (বুদ্ধি) আসিয়া দেখিল যে, অভিলাষ-প্রবৃত্তি ইতঃপূর্বেই মানুষের হৃদয়-রাজ্যটি ভালরূপে দখল করিয়া লইয়াছে এবং মনও ইহাতে অভ্যস্ত ও আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় তওবা ও মুজাহাদা (প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর সাধনা) দ্বারা হৃদয়-রাজ্যটিকে শয়তান ও প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্ত করত অধিকার করিয়া লওয়া বুদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া পড়ে। সুতরাং তওবা মানুষের জন্য নিতান্ত জরুরী এবং ধর্মপথ-যাত্রীর প্রথম ধাপ। তৎপর বুদ্ধির আলোকে এবং শরীয়তের নূরে জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া গেলে মানুষ যখন কুপথ ও সুপথ চিনিতে পারে, তখন তওবা ব্যতীত তাহার পক্ষে আর কিছুই কর্তব্য থাকে না। কারণ, কুপথ হইতে সুপথে ফিরিয়া আসাকেই তওবা বলে।

তওবার ফযীলত ও সওয়াব– প্রিয় পাঠক, অবগত হও, আল্লাহ্ তা'আলা সকলকেই তওবা করিতে আদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিলেন ঃ

تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র সমীপে তওবা কর যেন তোমরা কৃতকার্য হইতে পার।" (সূরা নূর, ৪ রুকূ, ১৮ পারা)

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয়ের (অর্থাৎ কিয়ামতের) পূর্ব পর্যন্ত তওবা করিবে, তাহার তওবাও কবূল হইবে।" তিনি অন্যত্র বলেন– "অনুতপ্ত হওয়াকেই তওবা বলে।" তিনি আর বলেন– "গল্পগুজব হইতেছে এমন রাস্তায় দণ্ডায়মান হইয়া থাকিও না। কারণ, এমন স্থলে দণ্ডায়মান ব্যক্তি অপর পথচারীকে দেখিয়া হাসি-ঠাট্টা করে এবং পথচারিণী নারীর সহিত অশ্লীল উক্তি করে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার জন্য দোযখ ওয়াজিব না হইয়া পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি সেই স্থান পরিত্যাগ করে না। কিন্তু সে যদি তওবা করে (তবে তাহার গুনাহ্ মাফ হইতে পারে।)" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "আমি প্রত্যহ সত্তর বার তওবা ও ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করিয়া থাকি।" তিনি অন্যত্র বলেন– "যে ব্যক্তি গুনাহ্ করিয়া তওবা করে, আল্লাহ লেখক-ফিরিশতাকে সেই গুনাহ্‌র কথা ভুলাইয়া দেন, সেই ব্যক্তির হস্তপদ, যে-অঙ্গ গুনাহ করিয়াছিল, ইহাকে ভুলাইয়া দিয়া থাকেন এবং যে-স্থানে গুনাহ করা হইয়াছিল সেই স্থানকেও ভুলাইয়া দেন, যেন সে যখন (কিয়ামত দিবসে বিচারার্থ) আহ্‌কামুল হাকিমীন আল্লাহ্‌র দরবারে উপনীত হয় তখন সেই পাপের কোন প্রমাণ পাওয়া না যায়।" তিনি আরও বলেন–"প্রাণ কণ্ঠাগত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা কবূল করেন।"

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি দিবসে গুনাহ করিয়া রজনীতে তওবা করে এবং যে-ব্যক্তি রজনীতে গুনাহ করিয়া দিবসে তওবা করে, তাহাদের তওবা কবূল করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় করুণার হস্ত বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। যত দিন পর্যন্ত পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় না হইবে তত দিন পর্যন্ত তাঁহার করুণার হস্ত এইরূপ প্রসারিত থাকিবে।"

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আমি সমস্ত দিনে এক শত বার তওবা করিয়া থাকি।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–" কোন ব্যক্তিই নিষ্পাপ নহে, কিন্তু যে-ব্যক্তি তওবা করে সে সকল পাপীর মধ্যে উত্তম।" তিনি বলেন–"যে ব্যক্তি গুনাহ করিয়া তওবা করে সে এমন (বেগুনাহ্) হইয়া যায় যেন সে গুনাহ্ই করে নাই।" তিনি আরও বলেন–"গুনাহ করিয়া তদ্রূপ গুনাহ্র ত্রি-সীমায় পুনরায় না যাওয়াকে তওবা বলে।"

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একদা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন– "হে আয়েশা, আল্লাহ্ বলেন – اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যাহারা নিজেদের ধর্মকে পৃথক পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে এবং দলে দলে বিভক্ত হইয়াছে (তাহাদের সহিত আপনার কোনই সংশ্রব নাই)।" এই আয়াতে বিদ্'আতী লোকদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা সকল গুনাহগারের তওবা কবূল করিয়া লন; কিন্তু বিদ্'আতী লোকদের তওবা কবূল করেন না। আল্লাহ্ বলেন– "আমি তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাহারা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন–"হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম আকাশে উন্নীত হইলেন। তথা হইতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, দুনিয়াতে জনৈক পুরুষ এক নারীর সহিত যিনা (ব্যভিচার) করিতেছে। তিনি তাহাদের জন্য বদ্দু'আ করিলেন। ইহাতে তাহারা মরিয়া গেল। তৎপর অপর এক ব্যক্তিকে গুনাহে লিপ্ত দেখিত পাইয়া তাহার জন্যও বদ্দো'আ করিলেন। (এমন সময়) আল্লাহ্ তা'আলা ওহী অবতীর্ণ করিলেন,–'হে ইবরাহীম, আমার বান্দাকে ক্ষমার চক্ষে অবলোকন কর। হয়ত তাহারা তওবা করিবে এবং আমি কবূল করিব, অথবা ক্ষমা চাহিবে আমি মাফ করিয়া দিব; কিংবা তাহাদের বংশে এমন সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিবে যাহারা আমার ইবাদত করিবে–এই তিনটির কোন একটি ত হইবে। তুমি কি জান না যে, আমার নাম সবূর (ধৈর্যশীল)?"

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "গুনাহ্র দরুন আল্লাহ তা'আলা যে-ব্যক্তিকে অনুতপ্ত দেখিতে পান, ক্ষমা চাহিবার পূর্বেই তিনি তাহাকে মাফ করিয়া

দিয়া থাকনে।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"পশ্চিম দিকে একটি দরজা আছে ইহার প্রস্থ সত্তর কি চল্লিশ বৎসরের রাস্তা। পৃথিবী ও আকাশ সৃজন অবধি এই দরজা তওবা গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত আছে এবং পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত ইহা খোলা থাকিবে।" তিনি অন্যত্র বলেন– "প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে মানুষের আমল (অনুষ্ঠিত কার্যাবলী) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয়। (ইতিমধ্যে) যে-ব্যক্তি তওবা করে তাহার তওবা কবূল হয় এবং যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহাকে মাফ করা হয়। কিন্তু যাহাদের হৃদয় হিংসায় ভরপুর তাহারা গুনাহ্গার অবস্থায়ই থাকিয়া যায়।"

মানব তওবা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, ইহা একটি উপমা দ্বারা রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন–"বান্দা তওবা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা এমন সরলপ্রাণ পল্লীবাসী অপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন যে, হিংস্র জন্তু-পরিপূর্ণ কোন জঙ্গলে যাইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া শয়ন করিয়া থাকেন। তাহার একটি উটও আছে যাহার পৃষ্ঠে তাহার সমস্ত পাথেয় ও খাদ্য সামগ্রী রহিয়াছে। কিন্তু সে জাগ্রত হইয়া দেখে যে উটটি নাই। সে উঠিয়া গিয়া এদিক-সেদিক উটের অনুসন্ধান করে (কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না। বরং উটের অনুসন্ধানে ছুটাছুটি করিতে করিতে) ক্ষুৎ-পিপাসায় তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। জীবনে সে নিরাশ হইয়া বলে–'আমি নিজ স্থানে যাইয়া মৃত্যুর জন্য শয্যা গ্রহণ করি।' তৎপর ঐ পল্লীবাসী ব্যক্তি এই স্থানে ফিরিয়া আসে এবং মৃত্যু অবধারিত জানিয়া শিয়রে হস্ত স্থাপনপূর্বক মূর্ছিত হইয়া পড়ে। কিন্তু তন্দ্রা ভঙ্গ হইলে স্বীয় হারানো উটটি সে তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিতে পায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাহার পক্ষে কর্তব্য। তাহার বলা উচিত–"হে আল্লাহ্, তুমি আমার প্রভু এবং আমি তোমার গোলাম।' কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে সে ভুলক্রমে বলে, 'হে আল্লাহ্, 'তুমি আমার গোলাম এবং আমি তোমার প্রভু।' অতএব পানাহার, মাল-আসবাব সব কিছু পাইয়া এই পল্লীবাসী যেরূপ সন্তুষ্ট হয়, (বিপথগামী ভ্রান্ত) মানব তওবা করিয়া সুপথে ফিরিয়া আসিলে আল্লাহ্ তা'আলা তদপেক্ষা অধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।"

তওবার হাকীকত– জ্ঞানের আলোক ও ঈমানের নূর হইতে তওবার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই নূরের জ্যোতিতে মানব দেখিতে পায় যে, গুনাহ মারাত্মক বিষ। সে যখন বুঝিতে পারে যে, সে এই বিষ বহু পরিমাণে পান

করিয়াছে এবং ইহার প্রভাবে এখন তাহাকে বিনাশ পাইতে হইবে, তখন তাহার হৃদয়ে তীব্র অনুতাপ ও ভীষণ ভয় জাগরিত হয়। যেমন যে ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে বিষ পান করে, সে ইহা জানামাত্র অনুতাপ ও মৃত্যুভয়ে অস্থির হইয়া উঠে এবং বমি করিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য গলার মধ্যে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়া দেয়। বমি করিয়া ফেলিয়া দেওয়া সত্ত্বেও উদরে বিষের লেশমাত্র রহিল কিনা, এই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া প্রতিষেধক ঔষধ ব্যবহার করে যাহাতে বিষের প্রতিক্রিয়া শরীর হইতে একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। তদ্রূপ গুনাহ্গার ব্যক্তি যখন উপলব্ধি করিতে পারে যে, 'আমি প্রবৃত্তির কুহকে পড়িয়া বিষমিশ্রিত মধু পান করিয়াছি–ইহা ত সেই সময় মিষ্ট বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু এই গুনাহ্ই পরিশেষে সর্পের ন্যায় দংশন করিয়া আমার বিনাশ সাধন করিবে,' তখন সেই গুনাহ্গারের হৃদয়ে অনুতাপ ও ভয়ের অগ্নি তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠে। কারণ, সেই সময় সে নিজকে ধ্বংসের মুখে দেখিতে পায়। আবার কোন গুনাহ্র বাসনা তাহার অন্তরে উদিত হইলে ইহার জ্বালায় সে দগ্ধ হইতে থাকে। এই জ্বালা গুনাহ্গারের অন্তরে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আনয়ন করে। অনুতাপানলের তেজে অভিলাষ-প্রভৃতি জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়া অনুতাপ-অনুশোচনার আকার ধারণ করে। অতীত পাপের ক্ষতিপূরণের জন্য সে তখন সচেষ্ট হয় এবং ভবিষ্যতে কখনও পাপের দিকে যাইবে না বলিয়া দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে।

অনুতাপের অগ্নি যে কেবল হৃদয়রাজ্যের পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে, তাহাই নহে, বরং ইহা বাহ্য অবস্থা এবং হাবভাব ও চাল-চলন পর্যন্ত বদলাইয়া দেয়। হঠকারিতার পোশাক বিদূরিত করিয়া ইহার স্থলে বিনয়ের পোশাক পরাইয়া দেয়। ইতঃপূর্বে সেই ব্যক্ত আত্মগর্ব, আপাত মধুর আমোদ-প্রমোদ ও মোহে নিমগ্ন থাকিত, এখন গতজীবনের অনুতাপ-অনুশোচনায় তাহার আপাদমস্তক জর্জরিত এবং তাহার নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত থাকে। তখন সে গাফিল লোকদের সাহচর্যে থাকিত, কিন্তু এখন সে আরিফগণের (চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের) সাহচর্যে থাকিতে ভালবাসে।

বাস্তবপক্ষে সচেতন অনুতাপকেই তওবা বলে। জ্ঞান ও ঈমানের নূর হইতেই ইহার উৎপত্তি। তৎপর ইহা শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়া অন্তর ও দেহ-রাজ্যের রূপ একেবারে বদলাইয়া দেয় এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে পাপ ও অবাধ্যতার দিক হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও বাধ্যতার কার্যে লিপ্ত করিয়া রাখে।

তওবা সর্বদা সকলের উপর ওয়াজিব–প্রিয় পাঠক, প্রত্যেকের উপর তওবা ওয়াজিব কেন, বুঝিয়া লও। বালিগ হওয়ামাত্র কাফির ব্যক্তির পক্ষে কুফর হইতে তওবা করা ওয়াজিব। তৎপর যে-মুসলমান সন্তান কেবল মাতা-পিতার অন্ধ অনুকরণ করে এবং মুখে ঈমানের কালেমা আওড়ায় কিন্তু তাহার অন্তর ইহা হইতে এমন গাফিল (অন্যমনস্ক, উদাসীন) থাকে যে, ইহার কোন প্রভাবই তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না, তবে এইরূপ গাফ্লত হইতে তওবা করা তাহার পক্ষে ওয়াজিব। এইরূপে তওবা করিতে হইবে যেন তাহার হৃদয় ঈমানের হাকীকত সম্বন্ধে অবগত ও সচেতন হইয়া ওঠে।

আমাদের উপরিউক্ত কথার উদ্দেশ্য এই নহে যে, প্রতিটি মুসলমান সন্তানকে আকায়িদের সমস্ত দলীল-প্রমাণ শিক্ষা করিতে হইবে। কেননা ইহা সকলের জন্য ওয়াজিব নহে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, ঈমানরূপ বাদশাহকে প্রতিটি মুসলমান সন্তানের হৃদয়ে অপ্রতিহত ও প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে, যেন তাহার হৃদয়-রাজ্যে একমাত্র ঈমানের হুকুমতই (শাসন) কায়েম থাকে। মানব-শরীরে প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এমন কি প্রতিটি লোমকূপ পর্যন্ত যখন ঈমান-বাদশাহ্র আজ্ঞাবহ হইয়া পড়ে এবং ইহার কোন স্থানেই শয়তানের শাসন না চলে, কেবল তখনই বুঝা যাইবে যে, মানবদেহে ঈমানের বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মানুষ যখন পাপকার্যে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহার ঈমান কামিল (পূর্ণ) থাকে না। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "যে ব্যক্তি যিনা ও চুরি করে, সে যিনা ও চুরি করিবার কালে মুমিন থাকে না।" এই হাদীসের অর্থে এই বুঝিও না যে, তদ্রূপ পাপ কার্যের সময় সেই ব্যক্তি কাফির হইয়া যায়। কিন্তু ঈমানের বহু শাখা প্রশাখা আছে। যিনা যে জীবন-সংহারক মারাত্মক বিষ ইহা উপলব্ধি করাও ঈমানের অন্যতম শাখা। সুতরাং হলাহল বিষকে মারাত্মক জানিয়া কেহই কখনও পান করে না। তবুও পান করিলে বুঝা যাইবে যে, যিনা যে মারাত্মক বিষ, এই ঈমান ও বিশ্বাসকে তৎকালে প্রবৃত্তি-রাজ পরাস্ত করিয়া দিয়াছিল, অথবা তাহার গাফ্লতের (অমনোযোগিতার) দরুন ঈমান তখন লুপ্তপ্রায় ছিল, কিংবা ঈমানের নূর কাম-প্রবৃত্তির অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে জানা গেল যে, সর্বপ্রথমে কুফ্র (খোদা-দ্রোহিতা) হইতে তওবা করা ওয়াজিব। তৎপর যে-সকল মুসলমান সন্তান অপরের

দেখাদেখি অন্ধ অনুকরণ করত মুখে ঈমানের কালেমা আওড়াইয়া নামের মুসলমান হইয়াছে, তাহাদের পক্ষেও তদ্রূপ ঈমান হইতে তওবা করিয়া পূর্ণ ঈমান লাভ করা ওয়াজিব। আবার এইরূপ তওবা করিয়াও হয়ত মানুষ পাপ হইতে একেবারে মুক্ত থাকিতে পারিবে না। এমতাবস্থায় গুনাহ্ হইতে তওবা করা ওয়াজিব হইয়া পড়িবে। তৎপর সে নিজের বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া লইতে পারিলেও তাহার হৃদয়ে হয়ত পাপের বীজ লুক্কায়িত থাকিবে, যেমন ভোজন লালসা, কথন-লোভ, ধন-মানের আসক্তি, হিংসা, অহংকার, রিয়া প্রভৃতি মারাত্মক প্রবৃত্তি তাহার হৃদয়ে প্রবল হইয়া থাকিতে পারে। এই সমস্তই মনের মলিনতা ও পাপের মূল। সুতরাং তৎসমুদয় হইতে তওবা করা ওয়াজিব যাহাতে প্রতিটি প্রবৃত্তিই মধ্যপন্থা অবলম্বন করে এবং বুদ্ধি ও শরীয়ত বিধানের আজ্ঞাধীন হইয়া পড়ে। (কারণ এইগুলি মূলে বিনষ্ট হইতে পারে না এবং মানব এইজন্য আদিষ্টও হয় নাই।) তবে প্রবৃত্তিসমূহকে আজ্ঞাধীন করিতে দীর্ঘ দিনের কঠোর সাধনা ও অসীম আত্ম-নিগ্রহের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

আবার কোন ব্যক্তি এই সকল হইতে পাক-পবিত্র হইলেও নানা অমূলক সন্দেহ, নফসের প্ররোচনা এবং অন্যায় চিন্তা উদিত হইয়া তাহার পদস্খলন ঘটাইতে পারে। এবংবিধ সকল বিষয় হইতে তওবা করাও ওয়াজিব। (এই ব্যাপারে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেও এক কঠিন সমস্যা তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ আল্লাহ্র যিকির হইতে গাফিল থাকে।) অথচ আল্লাহ তা'আলাকে ভুলিয়া জীবনের একটি মুহূর্তও অপচয় করা সকল ক্ষতির মূল। সুতরাং ইহা হইতেও তওবা করা ওয়াজিব। আর যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, সে সর্বদাই আল্লাহ্র যিকির ও চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে এবং নিমেষের জন্যও আল্লাহ্র যিকির হইতে উদাসীন হয় না, তথাপি তাহার সম্মুখে ক্রমোন্নতির বিভিন্ন ধাপ বাকী থাকে। এই ক্রমোন্নতির পথের প্রত্যেক পূর্ববর্তী ধাপ পরবর্তী উন্নততর ধাপের তুলনায় ক্ষতিজনক এবং পরবর্তী ধাপে আরোহণ যখন সম্ভবপর তখন সন্তুষ্টচিত্তে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা কেবল ক্ষতিই ক্ষতি। সুতরাং এইরূপ ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তদ্রূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা হইতে তওবা করত ক্রমোন্নতির দিকে অবিশ্রান্তভাবে অগ্রসর হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে বলিয়াছেন, তিনি

প্রত্যহ সত্তর বার তওবা করেন, ইহাও সম্ভবত এই শেষোক্ত কারণেই হইয়া থাকিবে। কেননা অনবরত উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়াই তাঁহার কাজ ছিল। তিনি যে ধাপেই উপনীত হইতেন, ইহা পূর্ববর্তী ধাপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম দেখিতে পাইতেন এবং তথা হইতে পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার অতীত অবস্থা বর্তমান অবস্থার তুলনায় মূল্যহীন ও অসম্পূর্ণ। তাই তিনি অনুতাপের সহিত তওবা করিতেন। বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝাইবার জন্য একটি উপমা গ্রহণ করা যাইতেছে। মনে কর, এক ব্যক্তি একটি কার্য সম্পন্ন করত ইহার বিনিময়ে একটি রৌপ্যমুদ্রা পাইয়া আনন্দিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝিতে পারিল সেই সময়ে সে একটি স্বর্ণ মুদ্রা লাভ করিতে পারিত, অথচ মাত্র একটি রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছে। এমতাবস্থায় সে দুঃখিত না হইয়া পারে না। তৎপর সে একটি স্বর্ণমুদ্রা পাইয়া তদপেক্ষা অধিক লাভের আর কিছুই হইতে পারে না ভাবিয়া খুব আনন্দিত হইল। কিন্তু ইহার পর সে জানিতে পারিল যে, এই সময়ে সে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের হীরক লাভ করিতে সক্ষম হইত। সুতরাং সে আবার দুঃখিত হয় এবং স্বীয় ত্রুটি স্বীকারপূর্বক লজ্জিত হয় ও তওবা করে। এইজন্যই বুযুর্গগণ বলিয়াছেন ঃ

حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّاٰتُ الْمُقَرَّبِيْنَ

অর্থাৎ "সাধারণ পুণ্যবান লোকদের নিকট যাহা পুণ্যের কাজ বলিয়া পরিগণিত তাহাই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের নিকট পাপ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে।"

প্রশ্ন ঃ– এ স্থলে কেহ হয়ত বলিবে কুফর ও গুনাহ্ হইতে তওবা করার পর উন্নততর মরতবায় উপনীত হওয়ার ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং উদাসীনতা হইতে তওবা করা অতিরিক্ত কর্মের অন্তর্ভুক্ত, ওয়াজিব নহে। এমতাবস্থায় ইহাকে ওয়াজিব বলা হইল কেন?

উত্তর ঃ–ওয়াজিব দুই প্রকার। জাহিরী ফত্ওয়া অনুসারে অনুকূল শরীয়তের বিধানসমূহ প্রতিপালন করা প্রথম প্রকারের ওয়াজিব। এই বিধানগুলি মানিয়া চলিলে পরস্পর স্বার্থের সংঘাতে দুনিয়া বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে না এবং জগদ্বাসী সুচারুরূপে জীবিকা নির্বাহ করিয়া যাইতে পারিবে। আর এই শ্রেণীর ওয়াজিবগুলি প্রতিপালন করিয়া গেলে মানুষ দোযখের আযাব হইতেও

অব্যাহতি পাইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াজিবগুলি প্রতিপালন করিয়া চলা জনসাধারণের ক্ষমতার বহির্ভূত। এইগুলি লংঘন করিলে দোযখের আযাবের ভয় না থাকিলেও পরকালে উচ্চ মরতবা লাভে বঞ্চিত থাকিতে হইবে এবং তজ্জন্য অপরিসীম মানসিক যাতনা ভোগ করিতে হইবে। ভূতল হইতে নক্ষত্রলোকের উচ্চতা যতদূর, আখিরাতে কোন কোন লোককে তদ্রূপ উন্নত দেখিয়া বহু পুণ্যবান লোককেও অসীম বেদনা পাইতে হইবে। নিজেদের অসম্পূর্ণতাই এমন যাতনার একমাত্র কারণ। তাই যাহাতে সেইরূপ যাতনা পাইতে না হয় তজ্জন্য তওবা করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়াজিব বলা হইয়াছে।

একবার চিন্তা করিয়া দেখ, নিজের সমশ্রেণীর কোন ব্যক্তিকে উচ্চ সম্মানে বিভূষিত দেখিলে অপরের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হইয়া থাকে এবং সংসার তখন তাহার নিকট নিতান্ত সংকীর্ণ ও অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হয়, হৃদয় ক্ষোভানলে দগ্ধ হইতে থাকে। যদিও দুনিয়ার বিচারে তাহাকে বেত্রাঘাত, হস্ত কর্তন বা অর্থ-দণ্ড ভোগ করিতে হয় না, তথাপি তদপেক্ষা অধিক মানসিক যাতনা তাহাকে সহ্য করিতে হয়। পরকালের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। সকলকেই সেই দিন অনুতাপ-অনুশোচনা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ইবাদত করে নাই সে তজ্জন্য অনুশোচনা করিবে এবং যে ব্যক্তি ইবাদত করিয়াছে কিন্তু অধিক পরিমাণে অতিরিক্ত ইবাদত করিয়া পরকালে উন্নত মরতবা লাভে বঞ্চিত থাকিবে, তাহাকেও অনুতাপ-অনুশোচনায় তীব্র মানসিক যাতনা ভোগ করিতে হইবে। এইজন্যই কিয়ামত-দিবসকে يَوْمُ التَّغَابُنِ অর্থাৎ 'গতানুশোচনার দিন' বলা হয়। আর এই কারণেই সকল নবীরই এই তরীকা ছিল যে, তাঁহারা সম্ভাব্য কোন প্রকার ইবাদত হইতেই বিরত থাকেন নাই যেন কিয়ামতের দিন স্বীয় ত্রুটির জন্য অনুতাপ-অনুশোচনা করিতে না হয়। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইচ্ছাপূর্বক ক্ষুধিত থাকিতেন, যদিও তিনি অবগত ছিলেন যে, আহার করা হারাম নহে। তিনি ক্ষুধার এমন তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিতেন যে, একদা হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া বলেন—"আমি রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র উদরে হাত বুলাইলাম এবং তাঁহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা), আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ হউক— আপনি যদি দুনিয়াতে তৃপ্তির সহিত আহার করেন তবে কি কোন ক্ষতি আছে?' রাসূলে

মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—'আমার উলূল আযম (চরম উন্নত অধ্যবসায়ের অধিকারী) ভ্রাতাগণ ইতঃপূর্বে আল্লাহ্‌র সমীপে উপনীত হইয়া মহান গৌরবের উৎকৃষ্ট সম্মানে পুরস্কৃত হইয়াছেন। দুনিয়া হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করিলে তাঁহাদের উচ্চ মরতবা অপেক্ষা আমার মরতবা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় বলিয়া আমার আশংকা হয়। প্রিয় ভ্রাতাগণ অপেক্ষা মর্যাদায় কম থাকার চেয়ে দুনিয়াতে এই কয়টা দিন ধৈর্যধারণ করিয়া থাকাকে আমি অধিক পছন্দ করি।" উক্ত প্রশ্নকারী এ স্থলে কি বলিতে চাহে?

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম একদা এক খণ্ড প্রস্তরের উপর মস্তক স্থাপনপূর্বক শয়ন করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় শয়তান তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল— "আপনি ত দুনিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু এখন তজ্জন্য অনুতাপ করিতেছেন।" হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কি করিয়াছি?" শয়তান বলিল—"আপনি প্রস্তরের উপর মাথা রাখিয়া বালিশের সুখ ভোগ করিতে চাহিতেছেন।" হযরত প্রস্তরটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"এই লও, দুনিয়ার সহিত ইহাও আমি তোমার জন্য পরিত্যাগ করিলাম।" একদা রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র পাদুকায় নূতন ফিতা লাগানো হইয়াছিল। ইহার উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইলে ইহা সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। তজ্জন্য নূতন ফিতা খুলিয়া লইয়া পূর্বের পুরাতন ফিতা লাগাইয়া দিবার আদেশ দিলেন।

একদা হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু দুগ্ধ পান করিলেন পানের পর তাঁহার মনে দুগ্ধ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাই তৎক্ষণাৎ তিনি স্বীয় গলদেশে অঙ্গুলি প্রবেশ করিয়া এমনভাবে বমি করিলেন যে, বমন করিতে করিতে দুধের সহিত তাঁহার প্রাণ পর্যন্ত বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। আচ্ছা, উপরিউক্ত প্রশ্নকারীই-বা এ স্থলে কি বলিবে? তাঁহার কি জানা নাই যে, একমাত্র সন্দেহ অবলম্বনে সাধারণ ফতওয়া অনুসারে বমন করা ওয়াজিব নহে? সর্বসাধারণের জন্য শরীয়তে সহজসাধ্য সরল ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাদের ফত্ওয়া এক প্রকার, আর মহামান্য সিদ্দীকগণ নিজেদের জন্য যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, ইহা অন্য প্রকার। এমতাবস্থায় সর্বসাধারণের সহিত তাঁহাদের কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে? মানব জাতির মধ্যে সিদ্দীকগণই আল্লাহ্ তা'আলার সম্যক পরিচয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকল বিষয় অবগত আছে এবং আল্লাহ্‌র পথে অগ্রসর হইতে হইলে যে সকল বাধাবিঘ্ন ও

বিপদাপদের সম্মুখীন হইতে হয়, ইহাও তাঁহারা ভালরূপে জানেন। ইহা মনে করিও না যে, সিদ্দীকগণ অনর্থক তদ্রূপ কষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তোমরা কেবল সাধারণ ফত্ওয়া অনুযায়ী চলিয়াই সন্তুষ্ট থাকিও না, বরং ধর্ম-বিষয়ে নেতৃস্থানীয় বুযুর্গগণের অনুসরণ করিয়া চল।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, কোন অবস্থাতেই মানুষ তওবা না করিয়া থাকিতে পারে না।

বৃথা সময় অপচয়জনিত অপরিসীম অনুশোচনা–সর্বাবস্থায়ই মানবের পক্ষে তওবা করা উচিত, এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই হযরত আবু সুলায়মান দারানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–"মানুষ যদি অন্য কোন কারণে রোদন না করিয়া কেবল জীবনের যে সময়টুকু সে বৃথা নষ্ট করিয়াছে, এইজন্যই রোদন করে, তবুও কিয়ামত পর্যন্ত রোদন করিলেও ইহা শেষ হইবে না।" এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি অতীতকাল বৃথা নষ্ট করিয়া তাহার ভবিষ্যত জীবনও বৃথা অপচয় করিতে বসিয়াছে, তাহার দুরবস্থার কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিবে? একবার ভাবিয়া দেখ, যে ব্যক্তি নিজের অমূল্য রত্ন নষ্ট করিয়া ফেলিল, সে অবশ্যই রোদন করিবে। আবার রত্ন নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাকে বিপদ ও আযাবে নিপতিত হইতে হয় তবে তাহার রোদন ও অনুশোচনার পরিসীমাই থাকিবে না। জীবনের প্রতিটি নিশ্বাস এক একটি অমূল্য রত্ন। ইহার বিনিময়ে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করা যাইতে পারে। এই অমূল্য পরমায়ু যদি কেহ পাপকার্যে ব্যয় করে এবং ইহা তাহার জীবননাশের কারণ হইয়া উঠে এবং সে উহা অবগত হয়, তবে তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে? কিন্তু মানব তাহার সর্বনাশের কথা এমন সময় জানিতে পারিবে যখন শত অনুতাপ-অনুশোচনায়ও কোন লাভ হইবে না। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ -

অর্থাৎ "আর আমি তোমাদিগকে যে জীবিকা দান করিয়াছি, মৃত্যু আসিবার পূর্বেই তাহা হইতে ব্যয় কর। (যদি তাহা না কর এবং মৃত্যু আসিয়া পড়ে তবে মুমূর্ষু ব্যক্তি) তখন বলিবে–"হে প্রভু, আমাকে সামান্য সময় অবকাশ দিলে না কেন?" (সূরা মুনাফিকূন, ২ রুকূ, ২৮ পারা)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বুযুর্গগণ বলেন–"মৃত্যুকালে মানুষ মৃত্যুর ফিরিশতাকে দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারে যে, এখনই সে পরলোকগমন করিবে। তখন মানব অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে এবং মৃত্যুর ফিরিশতার নিকট এক দিনের অবকাশ প্রার্থনা করে, যেন সে গুনাহ্র জন্য ক্ষমা চাহিয়া লইতে পারে। কিন্তু ফিরিশতা তাহার কথা শুনিবে না এবং বলিবে–'হে মানব, তোমাকে বহু দিনের অবসর দেওয়া হইয়াছিল। এখন তোমার পরমায়ুর একটি দিনও বাকী নাই, তোমার নির্দিষ্ট মৃত্যুর সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।' তৎপর মানুষ এক ঘণ্টার সময় প্রার্থনা করে। কিন্তু ফিরিশতা তখন এইরূপ বলে, 'তোমার জীবনের বহু ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়াছে। এখন আর এক ঘন্টাও বাকী নাই।" এমতাবস্থায় মানুষ নিতান্ত নিরাশ হইয়া পড়ে এবং তখন তাহার ঈমানও স্থির থাকে না। যাহার অদৃষ্টে সৃষ্টির আদিম সময়ে দুর্ভাগ্য নির্ধারিত আছে, সে ঈমানে সংশয় ও অস্থিরতা লইয়াই এই সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে এবং পরকালের অসীম দুর্ভোগে নিপতিত হয়। অপর পক্ষে সৃষ্টির আদিম কালে যাহার অদৃষ্টে সৌভাগ্য নির্ধারিত আছে, তাহার মূল ঈমান অটুট থাকে। এইজন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ -

অর্থাৎ "আর সেই সকল লোকের জন্য তওবা নাই যাহারা তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত মন্দ কার্য করিতে থাকে, তখন সে বলেন–'নিশ্চয়ই আমি এখন তওবা করিলাম।' (সূরা নিসা, ৩ রুকূ, ৪ পারা)

বুযুর্গগণ বলেন–"প্রত্যেক মানুষের সহিত আল্লাহ তা'আলার দুইট গুপ্ত রহস্য রহিয়াছে। প্রথমটি এই যে, সে যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় তখন আল্লাহ বলেন–'হে মানব, আমি তোমাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমানতস্বরূপ তোমাকে পরমায়ু দান করিয়াছি। সাবধান, মৃত্যুর সময় ইহা কিরূপভাবে আমাকে ফিরাইয়া দাও তাহাই আমি দেখিব।' দ্বিতীয় রহস্যটি এই যে, মৃত্যুকালে আল্লাহ মানুষকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন–'হে বান্দা, যে আমানত তোমার নিকট রাখিয়াছিলাম, ইহা দ্বারা কি করিয়াছ? যদি ভালরূপে ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া থাক, তবে পুরস্কার পাইবে।

আর যদি ইহা বৃথা নষ্ট করিয়া থাক, তবে দোযখ তোমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে এবং তুমি ইহার জন্য প্রস্তুত থাক।"

তওবা কবূল হওয়ার বিবরণ– তওবা কবূলের জন্য কতকগুলি শর্ত রহিয়াছে। এইগুলি যথারীতি পালন করিয়া তওবা করিলে তওবা অবশ্যই কবূল হইয়া থাকে। আন্তরিকতার সহিত তওবা করিয়া ইহা কবূল হইবে কিনা ভাবিয়া সন্দেহ পোষণ করিও না। বরং শর্তাবলী যথারীতি পালন করিয়া তওবা করা হইল কিনা, এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ কর। যে ব্যক্তি আত্মার যথার্থ পরিচয় লাভ করিয়াছে, দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ অবগত হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কি প্রকারে তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং কোন্ বস্তু আল্লাহ্ ও মানবের মধ্যে পর্দার সৃষ্টি করে, ইহা জানিতে পাইয়াছে, সে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারে যে, গুনাহ্র দরুনই পর্দার সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং তওবা দ্বারা পর্দা বিদূরিত হয়। আর আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে মানবের সম্মুখে যে পর্দা উপস্থিত হয় তাহা সরিয়া যাওয়ার নামই তওবা কবূল হওয়া।

বাস্তবপক্ষে মানবাত্মা ফিরিশতাজাতির সমশ্রেণীর এক পবিত্র রত্ন বিশেষ। আত্মা প্রথমে অতি স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় থাকে। দুনিয়ার পাপ-পঙ্কিলতা আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া না ফেলিলে ইহাতে আল্লাহ্র প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। আর মানব পাপ করিলে তজ্জনিত অন্ধকার আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ইবাদত করিলে আবার অন্তরে এক প্রকার নূর সৃষ্টি হয় এবং ইহা পাপের অন্ধকার বিদূরিত করে। এমতাবস্থায় তওবা আসিয়া পাপের অন্ধকার দূর করিয়া দিলে আত্মা নিজের স্বাভাবিক পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতা লাভ করে। কিন্তু বহু দিন ধরিয়া বরাবর পাপকার্য করিয়া চলিলে ইহার মলিনতা আত্মার অভ্যন্তর ভাগে গাঢ়ভাবে বসিয়া যায় এবং ইহা দূর করিবার কোন উপায় থাকে না। এই অবস্থায় উপনীত হইলে মরিচা-ধরা দর্পণের ন্যায় আত্মা তওবার উজ্জ্বলতা গ্রহণ করে না। অথচ এই শ্রেণীর লোক রসনায় তওবার বাক্য উচ্চারণ করিয়াই মনে করে আমি তওবা কারিয়াছি।

তওবা কবূল হওয়া সম্বন্ধে হাদীস ও বুযুর্গগণের উক্তি–মলিন বস্ত্র সাবান দিয়া ধৌত করিলে যেমন ইহা পরিষ্কার হইয়া যায়, তদ্রূপ ইবাদতের আলোকেও পাপজনিত অন্ধকার বিদূরিত হইয়া হৃদয় পাক-পবিত্র হইয়া উঠে। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"মন্দ কার্য ঘটিয়া গেলে অবিলম্বে সৎকার্য কর; তাহা হইলে সৎকার্য মন্দ কার্য মিটাইয়া দিবে।" তিনি বলেন–"গুনাহ্র স্তূপ আকাশ পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছিলেও তওবা কর; কারণ তবুও তওবা কবূল হইয়া থাকে।" তিনি অন্যত্র বলেন–"এমন লোকও হইবে যে পাপের কারণে বেহেশতে যাইবে।" সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করিলেন–"ইহা রাসূলাল্লাহ্, ইহা কিরূপে হইবে?" তিনি বলিলেন–"কেহ পাপ করিয়া এত অধিক অনুতপ্ত হয় যে, বেহেশতে প্রবেশ লাভ করা পর্যন্ত এই অনুতাপের প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকে।" (অর্থাৎ গুনাহ্ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে এমনভাবে তওবা করেন যে, এই অনুতাপানলে সর্বদা দগ্ধ হইতে থাকে এবং পুনরায় গুনাহ্ করিতে পারে না। কাজেই অবশেষে বেহেশতে প্রবেশ করে।) "বুযুর্গগণ বলেন–"তওবাকারী লোকদের সম্বন্ধে শয়তান বলে–'হায়! আমি যদি তাহাদিগকে পাপে লিপ্ত না করিতাম!"

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"পানি যেমন মলিন বস্ত্র ধুইয়া পরিষ্কার করে, পুণ্যও তদ্রূপ পাপ ধুইয়া ফেলে। তিনি অন্যত্র বলেন–"শয়তান অভিশপ্ত হইবার সময় বলিল–'হে আল্লাহ্, তোমার গৌরবের শপথ, মানুষের প্রাণ তাহার দেহ-পিঞ্জর হইতে বাহির না হওয়া পর্যন্ত আমি তাহার হৃদয় হইতে বাহির হইব না।' ইহার উত্তরে আল্লাহ্ বলিলেন–'আমি আমার গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি, যে পর্যন্ত তাহার প্রাণ দিল হইতে বহির্গত না হইবে, সেই পর্যন্ত আমিও তাহার তওবার দরজা উন্মুক্ত রাখিব।" এক হাবশী রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল–"হে আল্লাহ্র রাসূল, আমি অনেক গুনাহ করিয়াছি। আমার তওবাও কি কবূল হইবে?" তিনি বলিলেন–"হাঁ, কবূল হইবে।" ইহা শুনিয়া হাব্শী প্রস্থান করিল। কিন্তু কিছুদূর গমনের পর ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় নিবেদন করিল–"হে আল্লাহ্র রাসূল, গুনাহ করিবার কালে আল্লাহ্ কি দেখিতেছিলেন?" হযরত বলিলেন–"হাঁ, তিনি দেখিতেছিলেন।" ইহা শুনিয়া হাব্শী এক চীৎকার করত ভূতলে পড়িয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল।

হযরত ফুযাইল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–"আল্লাহ্ তা'আলা কোন এক পয়গম্বরকে বলিয়াছিলেন–'আমার গুনাহ্গার বান্দাগণকে সুসংবাদ প্রদান কর যে, তাহারা তওবা করিলে আমি কবূল করিব এবং সিদ্দীকগণকে ভয় প্রদর্শন কর যে, আমি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে তাহাদের কেহই আযাব হইতে

বাঁচিতে পারিবে না।" হযরত তলাক ইব্‌নে হাবীব রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন– "আল্লাহ্ সম্বন্ধে মানবের কর্তব্য এত অধিক যে, কিছুতেই সে উহা যথার্থভাবে সম্পন্ন করিতে পারে না। অতএব প্রত্যুষে তওবার সহিত শয্যাত্যাগ করা এবং রজনীতে তওবার সহিত শয্যা গ্রহণ করা কর্তব্য।" হযরত হাবীব ইব্‌নে আবূ সাবিত (র) বলেন–"কিয়ামত দিবস মানবের সম্মুখে পাপসমূহ উপস্থিত করা হইবে। যে ব্যক্তি পাপ দেখিয়া সভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া বলিবে, 'আমি ইহার জন্য সর্বদা ভয় পাইতাম,' তবে আল্লাহ্ তা'আলা এই ভয়ের কারণে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।"

বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি অত্যন্ত পাপী ছিল। সে তওবা করিতে চাহিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র দরবারে তাহার তওবা কবূল হইবে কি না, সে জানিত না। লোকে তাহাকে এক শ্রেষ্ঠ আবিদের সন্ধান দিল। পাপী ব্যক্তি এই আবিদের নিকট যাইয়া নিবেদন করিল–"আমি ঘোর পাপী। নিরানব্বইজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে আমি অকারণে হত্যা করিয়াছি। আমার তওবা কবূল হইবে কি?" আবিদ বলিলেন–"না।" তখন সেই ব্যক্তি উক্ত আবিদকেও হত্যা করিয়া নরহত্যার সংখ্যা একশত পূর্ণ করিল। তৎপর লোকে তাহাকে এক শ্রেষ্ঠ আলিমের সন্ধান দিল। সে এই আলিমের নিকট গমন করত জিজ্ঞাসা করিল–"আমার তওবা কবূল হইবে কি?" আলিম উত্তর দিলেন– "হাঁ, কবূল হইবে।" তবে তোমার বাসস্থান ফাসাদে পরিপূর্ণ। ইহা পরিত্যাগপূর্বক অমুক স্থানে চলিয়া যাইতে হইবে। সে স্থানে পুণ্যবান লোকগণ বাস করেন।" ইহা শুনিয়া পাপী লোকটি সেই স্থানের উদ্দেশ্য রওয়ানা হইল। কিন্তু পথিমধ্যেই সে মরিয়া গেল। তাহার আত্মা বেহেশ্‌তে লইয়া যাওয়া হইবে, কি দোযখে ফেলিতে হইবে, ইহা লইয়া আযাবের ও রহমতের ফিরিশতাদের মধ্যে মতভেদ হইল। উভয় ফিরিশতা তাহাকে দাবি করিতে লাগিল। আল্লাহ্ তা'আলা পাপীর গৃহ এবং পুণ্যবান লোকগণের আবাসস্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব মাপিবার আদেশ দিলেন। মাপিয়া দেখা গেল, মৃতদেহ ঠিক মধ্যপথ হইতে অর্ধহস্ত পরিমাণ পুণ্যবান লোকগণের নিকটবর্তী রহিয়াছে। তখন রহমতের ফিরিশতা তাহার আত্মা লইয়া গেল।

উল্লিখিত কাহিনী হইতে বুঝা গেল যে, পাপের পাল্লা একেবারে পাপশূন্য হওয়া নাজাতের (পবিত্রাণের) জন্য শর্ত নহে। বরং পাপের পাল্লা অপেক্ষা পুণ্যের পাল্লা একটু ভারী হইলে, এমন কি একটু ঝুঁকিয়া পড়িলেই নাজাত পাওয়া যাইবে।

কবীরা ও সগীরা গুনাহ–পাপ হইতে তওবা করিতে হয়। পাপ যত ছোট হয়, তওবাও তত সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু ছোট পাপেও হঠকারিতা করিলে তওবা কঠিন হইয়া পড়ে। হাদীস শরীফে আছে, ফরয নামাযে কবীরা গুনাহ ব্যতীত আর সকল গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হইয়া যায় এবং এক জুম'আ হইতে অপর জুম'আ পর্যন্ত কবীরা গুনাহ ব্যতীত সমস্ত গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ –

অর্থাৎ "যে কবীরা গুনাহ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা হইতে দূরে থাকিলে আমি তোমাদের সগীরা গুনাহ মাফ করিয়া দিব।"

কবীরা গুনাহ্‌র বিবরণ–কি কি কাজ করা কবীরা গুনাহ তাহা জানিয়া লওয়া ফরয। কবীরা গুনাহ্‌র সংখ্যা সম্বন্ধে সাহাবাগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ বলিয়াছেন, কবীরা গুনাহ সাতটি, কেহ-বা তদপেক্ষা অধিক, আবার কেহ-বা অল্প বলিয়াছেন।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, কবীরা গুনাহ সাতটি। কবীরা গুনাহ্ প্রায় সত্তরটি বলিয়াও অপর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে।

হযরত আবূ তালিব মক্কী রাহমাতুল্লাহি বলেন–"আমি হাদীস ও সাহাবীগণের উক্তি সংকলন করিয়া 'কুওয়াতুল কুতুব' নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছি যে, কবীরা গুনাহ সত্তরটি। ইহার মধ্যে চারটি হৃদয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, যথাঃ– (১) কুফর (খোদাদ্রোহিতা), (২) পাপে হঠকারিতার সংকল্প, যদিও লঘু পাপই হউক না কেন, যেমন কেহ মন্দ কাজ করে, ইহা হইতে তওবা করিবার ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করে না, (৩) আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হওয়া, (৪) আল্লাহ্ সব মাফ করিয়া দিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার ক্রোধের ভয় না করিয়া নিশ্চিত থাকা। চারটি কবিরা গুনাহ্ রসনার সহিত সম্বন্ধ রাখে। যথাঃ– (১) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যাহার ফলে কাহারো প্রাপ্য নষ্ট হয়, (২) সচ্চরিত্র নর-নারীর প্রতি ব্যভিচারের মিথ্যা দোষারোপ করা, যে দোষের জন্য শরীয়ত মতে শাস্তি প্রদান ওয়াজিব, (৩) মিথ্যা শপথ করা, কারণ ইহার ফলে কেহ স্বীয় ধন বা অপর কোন স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হয়, (৪) যাদুমন্ত্র মুখে উচ্চারণ করা। তিনটি কবীরা

গুনাহ উদরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে। যথাঃ– (১) মদ্যপান ও মাদক দ্রব্য সেবন, (২) ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, (৩) সুদ খাওয়া। দুইটি কবীরা গুনাহ গুপ্তাঙ্গের সহিত সম্পর্কে রাখে। যথাঃ– (১) যিনা (ব্যভিচার), (২) লাওয়াতাত (পুংমৈথুন)। দুইটি কবীরা গুনাহ হস্ত দ্বারা সম্পন্ন হয়। যথাঃ– (১) নরহত্যা, (২) চুরি করা, যাহাতে শরীয়ত অনুসারে শাস্তি প্রদান করা ওয়াজিব। একটি মহাপাপ পায়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে। তাহা হইল কাফিরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করা। অবশ্য অবস্থাভেদে পলায়ন করা দুরস্তও আছে। কাফির মুসলমানের দ্বিগুণের অধিক না হইলে অর্থাৎ এক মুসলমানের সঙ্গে দুই কাফির বা দশ মুসলমানের বিরুদ্ধে বিশ কাফির যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মুসলমানের পক্ষে পৃষ্ঠভংগ দিয়া পলায়ন করা কবীরা গুনাহ। কাফির মুসলমানের দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক হইলে পলায়ন জায়েয। একটি কবীরা গুনাহ সমস্ত দেহের সহিত সম্পর্ক রাখে। ইহা হইল মাতাপিতাকে দুঃখ দেওয়া।

প্রিয় পাঠক, অবগত হও, যে কয়টি গুনাহ্র পরিচয় দেওয়া হইল, তন্মধ্যে কতকগুলির জন্য শরীয়ত মতে শাস্তি প্রদান ওয়াজিব এবং অপরগুলির জন্য কুরআন শরীফে কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। এইজন্য এগুলি কবীরা গুনাহ্। ইহার বিস্তৃত বিবরণ 'ইয়াহ্ইয়াউল উলূম' গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তৎসমুদয়ের বর্ণনা সম্ভবপর নহে। লোকে অবগত হইয়া যেন কবীরা গুনাহ্ হইতে অতি সতর্কতার সহিত বিরত থাকে, এইজন্যই উহার পরিচয় দেওয়া হল।

পরপীড়নের পাপ ও ইহা মোচনের উপায়– প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, সগীরা গুনাহ্ হঠকারিতা করিয়া বারবার করিলে ইহা কবীরা গুনায় পরিণত হয়, যদিও এই কথা বলা হইয়াছে যে, ফরয নামাযে সগীরা গুনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়। অপর পক্ষে ইহাতে কোনই মতভেদ নাই যে, অত্যাচারপূর্বক অন্যের প্রতি কানাকড়ি পরিমাণ যুলুম অত্যাচার করিলেও ইহা প্রকৃত মালিককে প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত ফরযকার্য সম্পাদনে ইহা কখনও মাফ হয় না। মানুষের প্রতি অত্যাচারজনিত পাপ অপেক্ষা আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্যে অবহেলাজনিত পাপ মাফ পাইবার অধিক সম্ভাবনা রহিয়াছে।

মানবের ত্রিবিধ আমলনামা– হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মানুষের তিনটি আমলনামা থাকে। ইহার একটিতে শিরক গুনাহ্ লিপিবদ্ধ হয়। এইগুলি মাফের অযোগ্য। অপরটিতে আল্লাহ্ এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্কজনিত পাপ লিপিবদ্ধ হয়। আল্লাহ্র অপার রহমে এইগুলি মাফ হইয়া যাইতে পারে। অপর আমলনামাটিতে অন্যের প্রতি অত্যাচার-অবিচারজনিত পাপ লিপিবদ্ধ হয়। এই পাপসমূহ মাফ হইবার আশা নাই। যে কার্য দ্বারা কোন মুসলমানকে দুঃখ কষ্ট দেওয়া হয়, তাহাও এই শেষোক্ত আমলনামাতে লিপিবদ্ধ করা হয়–ইহা কাহাকেও শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দিয়া, আর্থিক ক্ষতি করিয়া, মানসম্ভ্রম নষ্ট করিয়া বা লোকের ধর্ম নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মের নামে ধর্ম-বহির্ভূত নব নব প্রথা প্রচলিত করিয়াই হউক অথবা পাপের প্রতি লোকের সাহসিকতা বৃদ্ধি পায় এমন কথা বলিয়াই হউক না কেন।

সগীরা গুনাহ্ কবীরা গুনায় পরিণত হওয়ার কারণ–সগীরা গুনায় লোকের আশা থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করিয়া দিবেন। কিন্তু কতিপয় কারণে উহা কবীরা গুনায় পরিণত হয় এবং ইহার বিপদও কঠিন হইয়া পড়ে। ছয়টি কারণে সগীরা গুনাহ্ কবীরা গুনায় পরিণত হয়।

প্রথম কারণ– হঠকারিতা করিয়া সগীরা গুনাহ বারবার করিতে থাকা; যেমন–সর্বদা গীবত (পরনিন্দা) করা, সর্বদা রেশমী বস্ত্র পরিধান করা বা ক্রীড়াকৌতুক প্রণোদিত হইয়া গানবাদ্য শ্রবণ করা। কারণ, অনবরত গুনাহ্ করিতে থাকিলে হৃদয় অত্যন্ত মলিন হইয়া পড়ে। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে নেক কার্য সর্বদা হইতে থাকে, তাহা অল্প হইলেও উত্তম।" ইহার উদাহরণ এইরূপ যে, বিন্দু বিন্দু পানি প্রস্তরের একই স্থানে অনবরত পড়িত থাকিলে প্রস্তরেও ছিদ্র হইয়া যায়। কিন্তু সমস্ত পানি একবারে প্রস্তরের উপর ঢালিয়া দিলে তদুপরি কোনই চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে না।

যাহা হউক, সগীরা কি কবীরা, যে-কোন গুনাহ্ সংঘটিত হওয়ামাত্র আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক ইহার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা উচিত এবং তদ্রূপ কার্য পুনরায় না করিবার জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে সর্বদা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকা আবশ্যক। বুযুর্গগণ বলেন–"কবীরা গুনাহ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ইহা সগীরা গুনায় পরিণত হয়। আবার সগীরা গুনাহ জিদ ধরিয়া বারবার করিতে থাকিলে ইহা কবীরা গুনাহ হইয়া পড়ে।"

দ্বিতীয় কারণ–গুনাহকে ক্ষুদ্র মনে করিলে এবং তুচ্ছজ্ঞানে উপেক্ষার চক্ষে দেখিলে সগীরা গুনাহ্ কবীরা গুনাহ্ হইয়া যায়। কিন্তু পাপকে গুরুতর মনে করিলে ইহা লঘু হইয়া পড়ে। ভয় ও ঈমানের কারণেই পাপকে গুরুতর মনে

করা যাইতে পারে। ইহা আত্মাকে এইরূপ বাঁচাইয়া রাখে যে, পাপের অন্ধকার হৃদয়ে বিস্তার লাভ করিতে পারে না। অপরপক্ষে পাপকে তুচ্ছজ্ঞান করা উদাসীনতা ও পাপের প্রতি আসক্তির কারণেই হইয়া থাকে। পাপকে তুচ্ছ মনে করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, পাপ হৃদয়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লইয়াছে। বস্তুত মনের সহিতই কাজের সম্বন্ধ এবং যাহা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, ইহাই অনেক বড় হইয়া পড়ে।”

হাদীস শরীফে আছে যে, মুসলমান স্বীয় পাপকে তাহার উপর পাহাড়-স্বরূপ মনে করে এবং কখন ভাঙ্গিয়া তাহার উপর পতিত হয়, এই ভয়ে সে সর্বদা ভীত থাকে। কিন্তু মুনাফিক পাপকে মাছির ন্যায় ধারণা করে এবং বিবেচনা করে, এখন নাকের উপরে বসিতেছে, পরক্ষণেই উড়িয়া যাইবে। বুযুর্গগণ বলেন, যে ব্যক্তি নিজ পাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং আশা করে যে, সমস্ত পাপই এইরূপ তুচ্ছ হউক, তাহার পাপ ক্ষমা করা হইবে না। এক পয়গম্বর আলায়হিস সালামের উপর ওহী অবতীর্ণ হইল–“পাপের ক্ষুদ্রতার প্রতি লক্ষ্য করিও না, আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কারণ তুমি মহান আল্লাহ্র আদেশ লঙ্ঘন করিলে।” মানব যতই আল্লাহ্র মহত্ত্ব অধিক পরিমাণে অবগত হইতে পারে ততই ক্ষুদ্র পাপকে বড় বলিয়া বুঝিতে পারে।

একজন সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন–“তোমরা এমন কাজ কর যাহাকে তোমরা পশমের ন্যায় হালকা মনে কর। কিন্তু আমরা প্রতিটি কাজকে পর্বতসম মনে করি। আর সকল পাপেই আল্লাহ্র ক্রোধ লুক্কায়িত আছে এবং যে পাপকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করা হয়, হয়ত ইহাতেই (আল্লাহ্র ক্রোধ) রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ –

অর্থাৎ “তোমরা ইহাকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিতেছে, কিন্তু আল্লাহ্র নিকট ইহা গুরুতর।” (সূরা নূর, ২ রুকূ, ১৮ পারা)

তৃতীয় কারণ–পাপ কার্যে আনন্দ পাওয়া ও গর্ব করা এবং ইহাকে নিজের লাভ ও বিজয় বলিয়া মনে করা। এইরূপ পাপী লোক হয়ত অন্যায় করত গর্ব করিয়া বলে–“আমি অমুককে ধোঁকা দিয়াছি–অমুককে খুব ভর্ৎসনা করিয়াছি–অমুকের ধন লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছি–অমুককে খুব গালি দিয়া

অপমানিত করিয়াছি–তর্কবিতর্কে অমুককে খুব যাতনা দিয়াছি এবং তাহার সহিত অত্যন্ত রাগ করিয়াছি” এবং এবংবিধ আরও বহু কথা বলিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি এইরূপ পাপ কার্য করিয়া আনন্দ পায় এবং বাহাদুরি করে তবেই বুঝা যায় যে, তাহার হৃদয় পাপের মলিনতায় জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছে এবং এই পাপেই যে বিনাশ হইবে। পাপ করিয়া এইরূপ আনন্দ অনুভব করিলে সগীরা গুনাহ্ কবীরা গুনায় পরিণত হয়।

চতুর্থ কারণ–আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন পাপ গোপন রাখেন, আর পাপী ইহাকে আল্লাহ্র করুণা মনে করিয়া নির্ভয় হইয়া পড়ে তবে লঘু পাপও মহাপাপে পরিণত হয়। পাপ গোপন থাকিলে এই ভাবিয়া ভয় করা উচিত যে, আল্লাহ্ পাপ কার্যে ঢিল দিলেন এবং ইহাতে পাপের বোঝা ভারি করিয়া অচিরেই তাহাকে ডুবিয়া মরিতে হইবে।

পঞ্চম কারণ–পাপ করত নিজেই ইহা প্রকাশ করিয়া দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা যে পাপ স্বাভাবিক আবরণে ঢালিয়া রাখেন, তাহা ছিন্ন করিয়া দেওয়া। ইহাতে যদি অপর লোক গুনাহ্র দিকে আকৃষ্ট হয় এবং পাপ কার্য করে তবে ইহার বোঝাও পাপ প্রকাশককে বহন করিতে হইবে। আর পাপী ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে পাপের দিকে উৎসাহ প্রদান করে এবং পাপ কার্যের উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া দেয়, এমন কি অপর লোকে তাহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া পাপে লিপ্ত হয়, তবে এইরূপ পাপী ব্যক্তি দ্বিগুণ পাপী হইবে। প্রাচীন বুযুর্গগণ বলেন–“মুসলমানের দৃষ্টিতে পাপকে সহজ ও তুচ্ছ প্রতিপন্ন করিয়া তোলা অপেক্ষা অধিক বিপদের আর কিছুই নাই।”

ষষ্ঠ কারণ–আলিম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দ্বারা পাপের অনুষ্ঠান। তাহাদিগকে পাপ কার্য করিতে দেখিলে পাপ কার্যের প্রতি সর্বসাধারণ লোকের সাহসিকতাও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কারণ তখন লোকে মনে করে যে, এইরূপ কার্য অন্যায় হইলে অমুক আলিম বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কখনই ইহা করিত না। কোন আলিম রেশমী পোশাক পরিধান করিলে, রাজপুরুষদের নিকট যাতায়াত করিলে ও তাহাদের দান গ্রহণ করিলে, নিজের ধন ও মানের গর্ব করিলে এবং তর্ক-বিতর্ককালে প্রতিপক্ষের প্রতি অসদ্ব্যবহার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিলে তাহার শিষ্যগণও তাহার অনুসরণ করিবে এবং তাহারাও উস্তাদের ন্যায়ই হইয়া পড়িবে। এই শিষ্যগণও যখন পরিণামে শিক্ষকতার কার্য করিবে তখন তাহাদের

শিষ্যগণও শিক্ষকের অনুসরণ করত তদ্রূপ গর্হিত কার্য করিতে থাকিবে। পরবর্তীকালে প্রতিটি শহর বা গ্রামের লোক তাহাদের কোন না কোন একজনের ভক্ত হইয়া পড়িবে এবং এই প্রকারে গ্রামকে গ্রাম ও শহরকে শহর ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। দেশে যত লোক উক্ত দৃষ্টান্তের অনুসরণে পাপ কার্য করিবে, সকল পাপ প্রাথমিক আলিম বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির আমলনামায় লিপিবদ্ধ হইবে। (কিন্তু ইহাতে অনুসরণকারীদের পাপের বোঝা মোটেই কমিবে না।)

এই কারণেই বুযুর্গগণ বলেন-"যে ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার গুনাহ্ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় সে-ই ভাগ্যবান।" এমন লোকও আছে যাহার মৃত্যুর পর তাহার পাপ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। বানী ইসরাঈলের একজন আলিম তওবা করিয়াছিল। এই উপলক্ষে তৎকালীন পয়গম্বরের (আ) নিকট আল্লাহ্ তা'আলা ওহী অবতীর্ণ করিলেন-"সে আলিমকে বলিয়া দাও, তোমার গুনাহ্ কেবল তোমার ও আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিতাম। এখন তুমি একাকী তওবা করিলে বটে; কিন্তু যে সম্প্রদায়কে তুমি পথভ্রষ্ট করিয়া ধ্বংসের পথে পরিচালিত করিলে তাহারা পূর্বের মতই পাপ করিয়া চলিয়াছে। ইহার কি করিবে? (অর্থাৎ তাহার অনুসরণকারিগণ পূর্ববৎ পাপ করিয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় তাহাদের সমান পাপ আসিয়া এই আলিমের আমলনামায় লিপিবদ্ধ হইতেছে। এই পাপের পথ বন্ধ হইবে কিরূপে?)

উপরিউক্ত কারণেই আলিমদের বিপদ অনেক। তাঁহাদের এক গুনাহ্ সহস্র গুনাহ্র সমান এবং তাঁহাদের এক ইবাদত সহস্র ইবাদতের সমান। কেননা যে আলিমের অনুসরণ করিয়া যত লোকে ইবাদত করে তাহাদের সকলের সওয়াবের সমষ্টি সেই আলিমের আমলনামাতে লিপিবদ্ধ হয়। এইজন্য আলিমের পক্ষে একেবারে গুনাহ্ না করা ওয়াজিব। ঘটনাচক্রে কোন গুনাহ্ হইয়া পড়িলে, ইহা অতি সাবধানতার সহিত গোপন রাখা কর্তব্য। এমন কি, আলিম কোন মুবাহ্ (নির্দোষ) কাজ করিলেও যদি উদাসীনতার দরুন পাপ কাজে জনসাধারণের সাহস বৃদ্ধি পায়, তবে তদ্রূপ মুবাহ কাজ পরিত্যাগ করা আলিমের পক্ষে উচিত। আল্লামা যহ্‌রী (র) বলেন-"আমি পূর্বে হাসি-ঠাট্টা করিতাম। কিন্তু এখন লোকে যখন আমার অনুসরণ করে তখন মৃদু হাস্য করাও আমার পক্ষে জায়েয নহে।"

আলিমগণের ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করাও মহাপাপ। কারণ এইরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা শুনিলে অনেক লোক বিপদগামী হইয়া পড়ে এবং গুনাহ্র কাজে তাহাদের সাহস বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সর্বসাধারণের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখাই যখন ওয়াজিব, এমতাবস্থায় ভাবিয়া দেখ, আলিমগণের দোষ-ত্রুটি গোপন করা কত বড় ওয়াজিব।

প্রকৃত তওবার শর্ত ও নির্দশন

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ- অনুতাপ ও তওবার সূচনা এবং পরিদৃশ্যমান দৃঢ় ও সংকল্প ইহার পরিণতি।

অনুতাপ-অনুতাপের অভ্যন্তরীণ নিদর্শন তওবাকারীর জ্বলন্ত পরিতাপ ও অপরিসীম মনস্তাপ এবং বাহিরের নিদর্শন বিলাপ ও ক্রন্দন। কারণ যে-ব্যক্তি নিজকে ধ্বংসের মুখে দেখিতে পায়, সে কিরূপে বেদনাক্লিষ্ট ও দুঃখভারাক্রান্ত না হইয়া থাকিতে পারে? কাহারও পুত্র যদি রোগাক্রান্ত হয় এবং কোন অমুসলমান চিকিৎসক যদি বলে যে, রোগীর অবস্থা বিপদজনক এবং তাহার বাঁচিবার আশা করা যায় না তবে পিতা কিরূপ যাতনানলে দগ্ধ হইতে থাকিবে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। আর সকলেই জানে যে, নিজের প্রাণ নিজের সন্তান অপেক্ষাও অধিক প্রিয়। আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের কথা অমুসলমান চিকিৎসকের কথা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য এবং আখিরাতে বিনাশের ভয় মৃত্যুভয় অপেক্ষা অধিক কঠিন। অপর পক্ষে গুনাহ্র দরুন আল্লাহ্র ক্রোধের সঞ্চার হওয়া যেরূপ প্রমাণিত সত্য, রোগের কারণে মরিয়া যাওয়া তত প্রমাণিত সত্য নহে। পাপ পাপীর মনে ভয় ও দুঃখ-যন্ত্রণার উদ্রেক না করিলে ইহাই বুঝা যাইবে যে, পাপের আপদ সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাসই জন্মে নাই।

মোটের উপর কথা এই যে, অনুতাপানল যত প্রখর হয়, পাপ ততই পুড়িয়া বিনষ্ট হয়। কারণ পাপ করিলে মানব-হৃদয়ে মরিচা পড়ে এবং অনুতাপের বহ্নি ব্যতীত আর কিছুই ইহা দূর করিতে পারে না। অনুতাপের তেজ মানবাত্মাকে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ করিয়া তুলে। তওবাকারীদের সংসর্গ অবলম্বনের জন্য হাদীস শরীফে আদেশ আছে, কেননা তাহাদের হৃদয় অত্যন্ত স্বচ্ছ হইয়া থাকে। যাহার

হৃদয় যত স্বচ্ছ, তাহার পাপও তত কম হয় এবং পূর্বে তাহার নিকট পাপকার্য মধুর বলিয়া বোধ হইয়া থাকিলে এখন ইহা পরিবর্তিত হইয়া বিস্বাদ ও তিক্ত বলিয়া মনে হয়। বানী ইসরাঈল বংশের একজন পয়গম্বর এক পাপীর তওবা কবূলের জন্য আল্লাহ্র নিকট অনুরোধ করিলেন। আল্লাহ্ ওহী অবতীর্ণ করিলেন–"আমার প্রতাপের শপথ, আকাশের সমস্ত ফিরিশতা তাহার জন্য অনুরোধ করিলেও যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার মনে পাপের আনন্দ বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ তাহার তওবা কবূল করিব না।"

প্রিয় পাঠক, জানিয়া রাখ, পাপ অতীব প্রলোভনের বস্তু হইলেও তওবাকারীর জন্য ইহা বিষমিশ্রিত মধুস্বরূপ। যে-ব্যক্তি একবার বিষমিশ্রিত মধু পান করিয়াছে, দ্বিতীয় বার ইহার কল্পনাও হৃদয়ে উদিত হইলে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। বিষের ভয়ে মধু লোভ সহজেই দমন হইয়া যায়। এই বিরাট পরিবর্তন কেবল এক শ্রেণীর পাপের সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সর্বপ্রকার পাপের মাধুর্যই এই অনুতাপের প্রভাবে তিক্ত হইয়া উঠে। কারণ, যে-পাপ সে করিয়াছে, ইহাতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি আছে বলিয়াই ইহা তাহার নিকট বিষতুল্য এবং সর্বপ্রকার পাপের সম্বন্ধেই এই নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য।

দৃঢ় সংকল্প (ইরাদা)– তওবাকারীর হৃদয়ে অনুতাপের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে তাহার মনে যে দৃঢ় সংকল্প জন্মে, ইহা বর্তমান, ভবিষ্যত এবং অতীত, এই তিন কালের সঙ্গেই সম্বন্ধ রাখে। অনুতাপজনিত এই সংকল্প বর্তমান কালে সমস্ত পাপ হইতে বাঁচাইয়া তাহাকে কর্তব্যকার্যে ব্যাপৃত করিয়া রাখে। তওবাকারী ভবিষ্যতের জন্য এমন দৃঢ় সংকল্প করিয়া লয় যে, সে সকল গুনাহ্ হইতে দূরে সরিয়া থাকিবে। আর সে আল্লাহ্র সহিত ভিতর-বাহিরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় যে, সে কখনও পাপের ত্রিসীমায় যাইবে না এবং কর্তব্য কর্মে আর ক্রটি-বিচ্যুতি করিবে না; যেমন যে-রোগী জানিতে পারিয়াছে যে, ফল খাইলে তাহার ক্ষতি হইবে, সে ইহা ভক্ষণ না করিবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। আর এইরূপ দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিতে সে কখনও ইতস্তত করিবে না, যদিও অসম্ভব নহে যে, প্রবৃত্তি তাহার উপর পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিতে পারে।

যে-ব্যক্তি তিনটি বিষয়ে অভ্যস্ত না হইয়াছে বা অভ্যস্ত হইবার ক্ষমতা না রাখে, সে তওবা করিতে পারে না। উহা হইল নির্জনতা অবলম্বন, চুপ থাকা এবং হালাল দ্রব্য ভক্ষণ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সন্দেহজনক দ্রব্যাদি হইতে হস্ত

সঙ্কুচিত করিতে না পরিবে, সেই পর্যন্ত তাহার তওবা পূর্ণ হয় না। অপর পক্ষে, যে-পর্যন্ত সে লোভ-লালসা পরিত্যাগ না করিবে, সেই পর্যন্ত সে সন্দেহজনক দ্রব্য হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। বুযুর্গগণ বলিয়াছেন যে, কোন দ্রব্যের উপর প্রবল লোভ জন্মিলে কষ্টেসৃষ্টে ইহার উপর হইতে সাতবার হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া লইতে পারিলে উহা পরিত্যাগ করা সহজ হইয়া পড়ে।

তওবাকারীর সংকল্পের সহিত অতীত কালের সম্বন্ধ এইরূপ থাকে যে, সে অতীত পাপের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রস্তুত হয় এবং এই উদ্দেশ্যে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য ও মানুষের প্রতি কর্তব্যকার্যগুলির মধ্যে কি কি ক্রটি করা হইয়াছে, সে ইহা বাহির করিয়া লয়।

আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য পালনের ক্রটির ক্ষতিপূরণ– আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য দুই ভাগে বিভক্ত; যথাঃ– (১) ফরয কাজ সম্পন্ন করা এবং (২) পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকা।

ফরযকার্যে ক্রটির ক্ষতিপূরণ–বালেগ হওয়ার পর হইতে অদ্যাবধি প্রতিটি দিন সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। ইহার মধ্যে যদি নামায কাযা হইয়া থাকে, নাপাক বস্ত্র লইয়া নামায পড়া হইয়া থাকে, নামাযী ব্যক্তির নিয়ত দুরস্ত ছিল না বা মূল বিশ্বাসে সন্দেহ ও দোষক্রটি ছিল ইত্যাদি কারণে যে সকল নামায দুরস্ত হয় নাই, উহার কাযা আদায় করিতে হইবে। যে তারিখ হইতে তুমি ধনবান বলিয়া গণ্য হইয়াছ, নাবালেগ থাকিলেও তদবধি যথারীতি হিসাব করিয়া যাকাত দেওয়া হয় নাই, অপাত্রে দেওয়া হইয়াছে বা স্বর্ণ-রৌপ্যের বাসনপত্র (অলংকারাদি) তোমার অধিকারে ছিল, অথচ উহার যাকাত দেওয়া হয় নাই, সেই সকলেরই হিসাব করিয়া যাকাত দিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তদ্রূপ বালেগ হাওয়ার পর হইতে রমযান শরীফের যতগুলি রোযা কাযা হইয়াছে, রোযার নিয়ত করিতে ভুলিয়া গিয়াছ বা শর্তপালনপূর্বক যথারীতি রোযা রাখ নাই, ততগুলি রোযারও কাযা আদায় করিবে। যে রোযাগুলি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে, উহার ত কাযা আদায় করিবেই এবং যেগুলিতে তোমার সন্দেহ থাকিবে এইগুলি সম্বন্ধে যেদিকে তোমার ধারণা প্রবল হইবে তদনুযায়ী কাজ করিবে। (অর্থাৎ যদি প্রবল ধারণা হয় যে, রোযা নষ্ট হইয়াছে তবে কাযা আদায় করিবে, অন্যথায় নহে।) প্রকৃত কথা এই যে, গভীরভাবে চিন্তার পর যতগুলি রোযা ঠিকভাবে আদায় হইয়াছে বলিয়া দৃঢ়

বিশ্বাস জন্মিবে ততগুলি বাদ দিয়া বাকীগুলির কাযা আদায় করিবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মনের প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করাও দুরস্ত আছে।

অন্যান্য পাপের ক্ষতিপূরণ–বালেগ হওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি চক্ষু, কর্ণ, হস্তপদ, রসনা, উদর প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা কি কি পাপ করিয়াছ, ভাবিয়া দেখিবে। যিনা, পুংমৈথুন, চুরি, মধ্যপান প্রভৃতি যে সকল পাপের জন্য শরীয়তে শাস্তি নির্ধারিত আছে তদ্রূপ কবীরা গুনাহ্ করিয়া থাকিলে অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা করিবে। কিন্তু এইরূপ পাপ করিয়া বিচারকের নিকট যাইয়া পাপ স্বীকারপূর্বক শাস্তি গ্রহণ করত প্রায়শ্চিত্ত করা ওয়াজিব নহে। বরং স্বীয় পাপ গোপন রাখিয়া অধিক পরিমাণ ইবাদত ও তওবা করত তদ্রূপ পাপের ক্ষতিপূরণ করা আবশ্যক। আর না-মুহার্‌রামের (যাহার সহিত জীবনে কখনও বিবাহ জায়েয) প্রতি দৃষ্টিপাত, বিনা ওযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ, নাপাক অবস্থায় মসজিদে উপবেশন, গানবাজনা শ্রবণ ইত্যাদি সগীরা গুনাহ্ হইয়া থাকিলেও তদ্রূপ ইবাদত এবং তওবা করিবে। আর এই শ্রেণীর গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারার জন্য তদ্‌বিপরীত কাজ করিবে। কারণ, সৎকাজ সগীরা গুনাহ্ মিটাইয়া দেয়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ –

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই পুণ্য পাপকে মিটাইয়া দেয়।" (সূরা হূদ, ১০ রুকূ, ১২ পারা।) কিন্তু সগীরা গুনাহ্‌র কাফ্‌ফারার উদ্দেশ্যে যে সৎকার্য করা হয়, তাহা ঠিক উহার বিপরীত এবং বিশেষ বলবান ও পরিমাণে যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

গানবাজনা শ্রবণের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কুরআন শরীফ শ্রবণ এবং ইলম চর্চার মজ্‌লিসে যোগদান করিবে। নাপাক অবস্থায় মসজিদে উপবেশন করার কাফ্‌ফারা ইবাদত ও ই'তিকাফ দ্বারা আদায় করিবে। মধ্যপানে যে পাপ হয়, ইহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজকে তোমার প্রিয় হালাল পানীয় দ্রব্য পানে বঞ্চিত রাখিয়া তাহা গরীবদিগকে দান করিয়া দিবে। মোটের উপর কথা এই যে, পাপ করিলে হৃদয়ে যে-মলিনতা জন্মে, ইহার বিপরীত সৎকার্য করিলে ইহা হইতে উৎপন্ন আলোকে সেই মলিনতা দূর হইয়া যায়। এমন কি, দুনিয়াতে যতগুলি আনন্দ উপভোগ করিয়াছ, ইহার প্রত্যেকটির বিপরীত এক একটি কষ্ট সহ্য করিয়া উহার কাফ্‌ফারা আদায় করিবে। কারণ দুনিয়ার আনন্দ ও আরাম ভোগে

দুনিয়ার প্রতি মন আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং কষ্ট ভোগ করিলে দুনিয়ার প্রতি মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। এইজন্যই হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, মুসলমানের প্রতি যে-দুঃখ অবতীর্ণ হয়, এমন কি যে-কাঁটা তাহার পায়ে বিদ্ধ হয়, ইহাতেও তাহার গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হইয়া থাকে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আল্লায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "কতকগুলি পাপ এমন আছে, কষ্ট ভোগ ব্যতীত যাহার অন্য কোন কাফ্‌ফারাই নাই।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন– "যে ব্যক্তি অনেক পাপ করিয়াছে, অথচ ইহা কাফ্‌ফারা হইতে পারে, সেই পরিমাণ ইবাদত সে করে নাই, তেমন লোকের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'আলা দুঃখ-কষ্ট সৃজন করিয়া দিয়া থাকেন যাহাতে ইহা গোনাহর কাফ্‌ফারা হইয়া যায়।"

প্রিয় পাঠক, এ-স্থলে বলিতে পার যে, এইরূপ দুঃখের উপর লোকের হাত নাই। অনেক সময় লোকে দুনিয়ার কাজ করিতে যাইয়া দুঃখিত হয়; ইহা স্বয়ং পাপ। সুতরাং ইহা অপর পাপের কাফ্‌ফারা হইবে কিরূপে? উত্তর এই–যে কার্য বা ঘটনা মানব-মনে ঘৃণা সঞ্চার করে, ইহাই তাহার জন্য মঙ্গলজনক। তদ্রূপ কার্য বা ঘটনা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতই হউক, তাহাতে কোনই আসে যায় না। কারণ, দুঃখ-কষ্টের বিনিময়ে যদি লক্ষ্যবস্তু পাওয়ার আনন্দ ভোগে আসিত, তবে মানব দুনিয়াকেই বেহেশ্‌ত বলিয়া মনে করিত।

হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "আমার শোক-কাতর বৃদ্ধ পিতাকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন?" হযরত জিবরাঈল আলায়হিস সালাম বলিলেন–"একশত জন পুত্র নিহত করা হইয়াছে, এমন জননীর যেরূপ শোক হইয়া থাকে, তদ্রূপ শোকে তাঁহাকে রাখিয়া আসিয়াছি।" হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন– "সেই শোক-দুঃখের বিনিময়ে তিনি কি পাইবেন?" হযরত জিব্‌রাঈল আলায়হিস সালাম বলিলেন– "একশত জন ইমাম ও শহীদের সওয়াব তাঁহাকে প্রদান করা হইবে।"

বান্দার প্রতি যুলুমের কাফ্‌ফারা–বান্দার প্রতি যে যুল্‌ম করা হইয়াছে, ইহার কাফ্‌ফারা আদায় করিবার জন্য যত লোকের সহিত সাংসারিক কাজকারবার করিয়াছ, উহার হিসাব করিয়া দেখিবে, এমন কি কাহার সহিত কিরূপে উপবেশন করিয়াছ, কিভাবে কথা বলিয়াছ, ইহাও হিসাব করিয়া লইবে। তোমার নিকট কাহারও প্রাপ্য থাকিলে, তুমি কাহাকেও দুঃখ দিয়া

থাকিলে বা কাহারও গীবত করিয়া থাকিলে, এই পাপের বোঝা হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিবে। যাহা ফিরাইয়া দেওয়ার উপযোগী তাহা ফিরাইয়া দিবে এবং যাহা ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, তাহা মাফ লইবে। কাহাকেও হত্যা করিয়া থাকিলে, হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। তাহারা প্রতিশোধও লইতে পারে বা ক্ষমাও করিতে পারে। কাহারও নিকট ঋণী থাকিলে ঋণদাতাকে তালাশ করিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে। সওদাগর ও তহশীলদারদের পক্ষে ইহা বড় কঠিন কাজ। কারণ, তাহাদিগকে অসংখ্য লোকের সাহিত আদান-প্রদান করিতে হয়। বিশেষত গীবতের ব্যাপার আরও কঠিন। কেননা, যাহাদের গীবত করা হইয়াছে, ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাহাদের সকলকে তালাশ করিয়া বাহির করা বড় দুষ্কর।

উপরিউক্ত উপায়ে হকদারের হক আদায় করিতে অক্ষম হইলে অধিক পরিমাণে ইবাদত করা ব্যতীত এই পাপ হইতে মুক্তি পাইবার অন্য কোন উপায় নাই। ইহকালে এত অধিক ইবাদত করিয়া লইবে যেন কিয়ামতের দিন এই ইবাদত দ্বারা উক্ত প্রকার ঋণ পরিশোধের পরও নিজের নাজাত পাওয়ার উপযোগী ইবাদত বাকী থাকে।

সর্বদা তওবার বিবরণ– যে ব্যক্তির পাপ হইয়াছে, তাহাকে অতি শীঘ্র ইহার ক্ষতিপূরণ ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য তৎপর হওয়া আবশ্যক। বুযুর্গগণ বলিয়াছেন—পাপ করার পর আট প্রকার কার্য করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চারিটি মনের সহিত এবং চারিটি শরীরের সহিত সম্বন্ধ রাখে। যে-চারিটি কার্য মনের সহিত সম্বন্ধ রাখে তাহা এই-(১) তওবা বা তওবার সংকল্প; (২) তদ্রূপ পাপ পুনরায় না করার দৃঢ় সংকল্প; (৩) সেই পাপের কারণে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, এই ভয় ও (৪) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা পাইবার আশা পোষণ করা। যে চারিটি কার্য শরীরের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা এই- (১) দুই রাক'আত তওবার নামায পড়া; (২) সত্তর বার ইস্তিগ্ফার এবং একশত বার

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ –

এই কলেমা পড়া (৩) সামান্য হইলেও গরীবদিগকে কিছু দান করা এবং (৪) একদিন রোযা রাখা।

কোন কোন বুযুর্গ বলিয়াছেন—পাপ কার্য সংঘটিত হওয়ামাত্র ওযু-গোসল করত যথারীতি পবিত্র হইয়া মসজিদে যাইয়া দুই রাক'আত নামায পড়িবে।

হাদীস শরীফে আছে–"গোপনে গুনাহ্ করিয়া থাকিলে ইবাদতও গোপনে কর এবং প্রকাশ্যে গুনাহ্ করিয়া থাকিলে ইবাদতও প্রকাশ্যে কর। ইহাতে গুনাহর কাফ্ফারা হইবে।"

অন্তরের সহিত ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) না করিয়া কেবল মুখে বলিলে কোন লাভ হয় না। ইস্তিগ্ফারের সময়ে বিলাপ, ভয় এবং অনুতাপ ও লজ্জার সহিত ক্ষমতা প্রার্থনা করিলে আন্তরিক ইস্তিগ্ফার হইয়া থাকে। তদ্রূপ করিতে পারিলে তওবার ইচ্ছা মযবুত না হইলেও পাপমুক্তির আশা করা যায়। মন অন্যমনস্ক থাকিলেও মৌখিক ইস্তিগ্ফার একেবারে নিষ্ফল নহে। ইহাতে অন্য কোন লাভ না হইলেও রসনা বেহুদা উক্তি হইতে বাঁচিয়া থাকিবে এবং চুপ থাকা অপেক্ষা ইস্তিগ্ফারের কলেমা মুখে উচ্চারণ করা কত ভাল। কারণ জিহবা মঙ্গলজনক বাক্য উচ্চারণে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে মানুষ নিরর্থক বাক্যালাপ অপেক্ষা ইস্তিগ্ফারের দিকে অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে।

হযরত আবূ ওসমান মাগরিবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হির জনৈক মুরীদ একদা তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন–"কোন কোন সময় আমার জিহবা আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত হইয়া পড়ে যদিও মন ইহার প্রতি আকৃষ্ট থাকে না।" উত্তরে তিনি বলিলেন–"তোমার একটি অঙ্গকে যে আল্লাহ্ তাঁহার যিকিরে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, এইজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

আন্তরিকতাবিহীন তওবাকারীর প্রতি শয়তানের ধোঁকা–এ স্থলে শয়তান বিষম ধোঁকা দিয়া বলিতে থাকে– "তুমি যখন সর্বান্তঃকরণে যিকির করিতে পার না, তখন মুখে কতকগুলি যিকিরের শব্দ উচ্চারণ করা অন্যায় ও বে-আদবী। কাজেই এমন যিকির বন্ধ কর।" শয়তানের এই প্রবঞ্চনার উত্তর দিতে যাইয়া মানব তিন দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের প্রথম দলই অগ্রবর্তী। এই দলের লোক শয়তানের প্রশ্নের উত্তরে বলে–"তুই সত্য বলিয়াছিস। বেশ, আমি তোকে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে বলপ্রয়োগে সর্বান্তঃকরণে যিকির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।" এই দল শয়তানের কাঁটা ঘায়ে লবণ ছিটা দিয়া থাকে। দ্বিতীয় দল যালিম। তাহারা শয়তানকে উত্তর দিয়া বলে–"তুমি সত্যই বলিয়াছ। অবশ্যই রসনা সঞ্চালন নিষ্ফল।" এই কথা বলিয়া যিকির পরিত্যাগ করত তাহারা চুপ থাকে এবং মনে করে, তাহারা বুদ্ধিমানের কাজ করিল। অথচ বাস্তবপক্ষে তাহারা শয়তানের অনুকূল ও অনুরক্ত হইল। তৃতীয় দল স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া শয়তানকে উত্তর দেয়–"যদিও মনেপ্রাণে যিকির করিতে

পারি না তবুও রসনাকে আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত রাখা ত চুপ থাকা অপেক্ষা ভাল। যেমন বাদশাহী পোদ্দারী অপেক্ষা ভাল এবং পোদ্দারী মেথরের কাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব যে-ব্যক্তি বাদশাহী করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে পোদ্দারী কাজও পরিত্যাগপূর্বক মেথরের কাজ গ্রহণ করা জরুরী নহে।"

তওবা করিতে অনিচ্ছার প্রতিকার–যে ব্যক্তি তওবা করিতে চায় না, তাহার প্রতিকার এই—পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, সে কি কারণে পুনঃ পুনঃ পাপ কাজ করে এবং কেনই-বা সে তওবা করে না। ইহার পাঁচটি কারণ রহিয়াছে। প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক প্রতিকার ব্যবস্থা আছে।

প্রথম কারণ–আখিরাতে বিশ্বাস না করা বা আখিরাত সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা। বিনাশন খণ্ডের দশম অধ্যায়ে ইহার প্রতিকার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

দ্বিতীয় কারণ–লোভ-লালসার প্রবলতা সংবরণ করিতে না পারা এবং সংসারের আনন্দ উপভোগে মত্ত হওয়া। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে হৃদয়ে পরকালের ভয় উদয় হয় না এবং অনেক লোকের পক্ষে সাধারণত লোভ-লালসাই বিষম অন্তরায় হইয়া থাকে। এইজন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্ তা'আলা দোযখ সৃষ্টি করিয়া জিবরাঈল আলায়হিস্ সালামকে দেখিতে বলিলেন। তিনি দেখিয়া বলিলেন–'তোমার শপথ, দোযখের পরিচয় পাইলে কেহই উহার দিকে যাইবে না।' তৎপর আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের চতুর্দিকে প্রলোভনের বস্তুসমূহ সৃজন করিয়া জিবরাঈল আলায়হিস সালামকে পুনরায় দেখিতে বলিলেন। জিবরাঈল আলায়হিস সালাম দেখিয়া বলিলেন– 'কোন লোকই দোযখ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। (অর্থাৎ লোভ-লালসায় আকৃষ্ট হইয়া দোযখে প্রবেশ করিবে।)' ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্ত সৃজন করত হযরত জিবরাঈলকে (আ) দেখিতে আদেশ করিলেন। তিনি দেখিয়া নিবেদন করিলেন–'বেহেশতের পরিচয় পাইলে সকলেই ইহার দিকে দৌড়াইয়া আসিবে।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতের চারি পার্শ্বে বেহেশতের পথ-প্রতিবন্ধকস্বরূপ প্রবৃত্তির কাম্য বস্তুসমূহের পরিপন্থী বিরক্তিকর এবং ক্লেশজনক ও তিক্ত কার্যকলাপের সৃষ্টি করিয়া আবার দেখিতে আদেশ দিলেন। তিনি দেখিয়া বলিলেন–'তোমার প্রতাপের শপথ, বেহেশতের পথে যে সকল দুঃখ-কষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছ, ইহাতে আমার ভয় হইতেছে যে, কেহই বেহেশতে যাইবে না।"

তৃতীয় কারণ–আখিরাতের আরাম-আয়েশকে লোকে কেবল ভবিষ্যতের অঙ্গীকার বলিয়া মনে করে এবং দুনিয়াকে নগদ ভাবিয়া ইহার প্রতি শীঘ্র আসক্ত হইয়া পড়ে। কেননা, যাহা বাকী, তাহা চক্ষের অন্তরালে থাকে এবং যাহা চক্ষের দৃষ্টিতে পতিত হয় না, তাহা মন হইতেও দূরে সরিয়া থাকে।

চতুর্থ কারণ–দীর্ঘসূত্রিতা। মুমিন ব্যক্তি সর্বদা তওবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করে। কিন্তু কাজের বেলায় 'এখন না, তখন করিব' ভাবিয়া অনর্থক বিলম্ব করে। এমন সময় লোভ-লালসা উপস্থিত হইলে বলে, "এখন ত ইহা ভোগ করিয়া লই; তৎপর তওবা করিয়া লইব।"

পঞ্চম কারণ–পাপের দরুন দোযখে যাইতে হইবে, ইহা না ভাবিয়া বরং আল্লাহ্ মাফও করিয়া দিতে পারেন, এইরূপ মনে করা। মানুষ সর্বদা নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করে এবং লোভ-লালসা প্রবল হইয়া উঠিলে বলে, 'ইহা চরিতার্থ করিয়া লই; আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করিয়া দিবেন।'

এ-স্থলে উল্লিখিত পাঁচটি কারণভেদে তওবা করিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির প্রতিকার-ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে। প্রথম কারণ অর্থাৎ আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস দূর করিবার ব্যবস্থা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি আখিরাতকে বাকী মনে করে এবং দুনিয়াকে নগদ ভাবিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়—আখিরাতকে চক্ষুর অগোচরে বলিয়া মন হইতেও দূরে রাখে, তাহার প্রতিকার এই ঃ—মনে কর, যাহা নিশ্চয়ই আসিবে, তাহা এখনই আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্যাপার শুধু এতটুকু যে, যখন চক্ষু মুদিত হইল ও মৃত্যু ঘটিল, তখনই আখিরাত নগদ হইয়া পড়িল। আজই মৃত্যু ঘটিতে পারে এবং এই মুহূর্তেই বাকী নগদ হইয়া যাইতে পারে। অপরপক্ষে যে দুনিয়াকে তুমি নগদ বলিয়া মনে করিতে ইহাই অতীত স্বপ্নবৎ হইয়া যাইবে। তৎপর যে-ব্যক্তি দুনিয়ার লোভ-লালসা ও সুখাস্বাদের সামান্য উত্তেজনা সহ্য করিতে পারিতেছে না, তাহার ভাবিয়া দেখা উচিত, সে দোযখের অগ্নি কিরূপে সহ্য করিবে? আবার বেহেশতের অপরিসীম সুখভোগের লোভ সে কিরূপে সংবরণ করিবে? দেখ, রোগীর পক্ষে সুশীতল পানি সর্বাপেক্ষা লোভনীয় হইলেও যদি কোন অমুসলমান চিকিৎসকও পানিকে অনিষ্টকর বলিয়া অভিমত প্রকাশ করে, তবে আরোগ্য লাভের আশায় সে পানি পান পরিত্যাগ করে এবং স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের উক্তি অনুযায়ী আখিরাতের চিরস্থায়ী বাদশাহীর আশায় দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুর আনন্দের লোভ-লালসা পরিত্যাগ করা কত শ্রেয়।

যে-ব্যক্তি তওবা করিতে বিলম্ব করে, তাহাকে বলা উচিত–"তুমি কিসে ভুলিয়া রহিয়াছ? অদ্য তওবা না করিয়া কল্য করিবে বলিয়া কেন বিলম্ব করিতেছ? কল্যকার দিন তোমার ভাগ্যে নাও ঘটিতে পারে; তুমি অদ্যই মরিয়া যাইতে পার।" এইজন্যই হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, পাপ পরিত্যাগ করিতে বিলম্বকারীকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক–"তুমি তওবা করিতে বিলম্ব করিতেছ কেন? তুমি যদি মনে করিয়া থাক যে, অদ্য পাপকর্ম পরিত্যাগ করা কঠিন, কল্য সহজ হইবে, তবে এমন অসম্ভব কল্পনা তোমার মন হইতে দূর করিয়া ফেল। কারণ, অদ্য যেমন কঠিন, কল্যও তেমন কঠিন থাকিবে। আল্লাহ তা'আলা এমন কোন দিন সৃজন করেন নাই, যে-দিন লোভনীয় বস্তু পরিত্যাগ করা সহজ।

তুমি যদি মনে করিয়া থাক যে, কল্য পাপ বর্জন করা সহজ হইবে, তবে তোমার উদাহরণ এইরূপ—মনে কর, এক ব্যক্তিকে একটি চারা গাছ সমূলে উপড়াইয়া ফেলিতে আদেশ করা হইল। কিন্তু সে বলে– "গাছটি অত্যন্ত মযবুত; কিন্তু আমি নিতান্ত দুর্বল। আমি সবল হইলে এক বৎসর পর গাছটি উৎপাটন করিয়া ফেলিব।" এমন ব্যক্তিকে তাহার উত্তরে বলা যাইবে–"হে নির্বোধ, আগামী বৎসর বৃক্ষ অধিকতর মযবুত এবং তুমি আরও দুর্বল হইয়া পড়িবে। তদ্রূপ তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিলে কু-প্রবৃত্তিরূপ বৃক্ষও দিন দিন মযবুত হইতে থাকিবে এবং ইহার বিরুদ্ধাচরণে তোমার শক্তি ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকিবে। অতএব যত তাড়াতাড়ি এই বৃক্ষ উৎপাটন কর, উৎপাটন-কার্য ততই তোমার পক্ষে সহজ হইবে।"

যে-ব্যক্তি নিজে মুসলমান বলিয়া ভরসা করিয়া বলে–"আমি মুসলমান; আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানকে মাফ করিয়া দিবেন।" তেমন ব্যক্তিকে আমরা বলিব–"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে মাফ নাও করিতে পারেন। তুমি ইবাদত না করার দরুন তোমার ঈমানরূপ বৃক্ষ দুর্বল হইয়া যাইতে পারে এবং অন্তিমকালে মৃত্যু-যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে ইহা সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইতে পারে। কারণ ঈমানরূপ বৃক্ষ ইবাদতরূপ পানিতে জীবিত থাকিয়া বর্ধিত ও শক্তিশালী হয়। পানি না পাইলে ইহার পক্ষে মরিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে।" যে-ব্যক্তি অনেক পাপ করিয়াছে এবং ইবাদত করে নাই, সে এমন রোগীতুল্য যাহার রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং যে-কোন মুহূর্তে সে মরিতে পারে। এমন দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট লোক ঈমান লইয়া মরিতে পারিলেও আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম রহমতে

তাহাকে মাফ করিয়া দিতে পারেন অথবা মাফ না করিয়া তাহাকে শাস্তিও দিতে পারেন। এমতাবস্থায় শুধু সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া কর্তব্যকার্যে অবহেলা করত বসিয়া থাকা নিতান্ত বোকামি নয় কি?

যে-ব্যক্তি ক্ষমা পাওয়ার সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া কর্তব্যকার্যে শৈথিল্য করে, তাহাকে এমন লোকের সহিত তুলনা করা যায়, যে নিজের যথাসর্বস্ব বিনষ্ট করিয়া নিজের পরিবারবর্গকে অনাহারে রাখে এবং বলে–"হয়ত তাহারা কোন জনশূন্য শহরে যাইয়া তথাকার লুক্কায়িত ধন সংগ্রহ করিতে পারিবে।" অথবা তদ্রূপ ব্যক্তিকে এমন লোকের সহিত তুলনা করা চলে, যে দেখিতেছে, তাহার শহরে ডাকাত দল আসিয়া শহরবাসীদের সমস্ত ধন লুণ্ঠন করিয়া লইতেছে; অথচ সে তাহার ধন লুকাইতেছে না, বরং প্রকাশ্যভাবে ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিতেছে এবং মনে করিতেছে–"হয়ত ডাকাত আমার গৃহে আসিয়াই মরিয়া যাইবে বা লুণ্ঠন করিবে না; অথবা অন্ধ হইয়া যাইবে এবং আমার গৃহ দেখিতে পাইবে না।" এই সমস্তই সম্ভবপর। (কিন্তু এইরূপ যে হইবে, ইহার নিশ্চয়তা কি? পরকালে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা পাইবার আশাও তদ্রূপ সম্ভাবনা মাত্র। কিন্তু এই সম্ভাবনার উপর নির্ভর করত সতর্কতা অবলম্বন না করা নিতান্ত মূর্খতা।

একাধিক পাপে লিপ্ত ব্যক্তির তওবা–যে ব্যক্তি একাধিক পাপে লিপ্ত, সমস্ত পাপ হইতে এক সঙ্গে একেবারে তওবা না করিয়া এক একটি পাপ হইতে তওবা করা তাহার পক্ষে জায়েয কিনা, এই সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন–"একই ব্যক্তি যিনা হইতে তওবা করিয়া মদ্যপান হইতে তওবা করিবে না, ইহা সম্ভবপর নহে। কারণ, পাপ মনে করিয়া সে যদি যিনা হইতে তওবা করে, তবে মদ্যপানও তদ্রূপ পাপ। অধিক পরিমাণে মদ্যপান হইতে তওবা করত অল্প পরিমাণে পান করা যেমন ইহাও তদ্রূপ। কেননা উভয়ই সমভাবে হারাম। পাপের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। কিন্তু একাধিক পাপে লিপ্ত ব্যক্তির পক্ষে এক একটি করিয়া পাপ পরিত্যাগ করা অসম্ভব নহে। কারণ, কেহ হয়ত যিনাকে মদ্যপান অপেক্ষা অধিক মন্দ জানিয়া যাহা অধিক মন্দ, ইহাই সর্বাগ্রে বর্জন করে। আবার কেহ হয়ত মদ্যপানকে যিনা হইতে অধিক মন্দ মনে করে; কেননা ইহা যিনা ও অন্যান্য পাপে লিপ্ত করে। আবার কেহ-বা গীবতকে মধ্যপান অপেক্ষা অধিক মন্দ বুঝে; কেননা গীবতের পাপ অপর লোকের সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং মদ্যপানকে কেবল স্বয়ং তাহার সহিত

সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করে। কোন লোক অপরিমিত মধ্যপান হইতে বিরত থাকে: কিন্তু মূল মধ্যপান হইতে বিরত হয় না। এমন লোকে মনে করে–"আমি যত অধিক মধ্যপান করিব তত অধিক পাপ হইবে। আমি মদ্যপান একেবারে বর্জন করিতে পারি না, কিন্তু অধিক পরিমাণে পান বর্জন করিতে পারি। শয়তান আমাকে একটি কাজে প্রলোভন দিয়া জয়ী হইয়াছে বলিয়া অপরটিতে সে আমাকে পরাস্ত করিতে পারে না, ইহাতেও শয়তানের অনুসরণ করা আমার পক্ষে জরুরী নহে।"

ফলকথা, উপরিউক্ত উপায়ে ক্রমশ পাপ পরিত্যাগ করাও সম্ভবপর। হাদীস শরীফে আছে اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللهِ - অর্থাৎ "তওবাকারী আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র।" এবং আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ - অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারিগণকে ভালবাসে।" এই উভয় পবিত্র বাক্যে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি সমস্ত গুনাহ্ হইতে তওবা করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন এবং যে সকল আলিম বলেন–"সকল পাপ একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া বিশেষ বিশেষ পাপ পরিত্যাগ করা জায়েয নহে"–তাঁহারা আল্লাহ্‌র এইরূপ প্রিয়পাত্রদের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন। অন্যথায় তওবা করিলেই সগীরা গুনাহ্ মাফ হইয়া যায় এবং গুনাহ্ লোপ পায়। সকল পাপ হইতে একসঙ্গে একেবারে তওবা করা দুষ্কর এবং তওবা সাধারণত ক্রমশই হইয়া থাকে। তওবা করিবার সুযোগ যতটুকু ঘটে, সওয়াবও ততটুকুই পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা

ধৈর্যের ফযীলত–প্রিয় পাঠক, অবগত হও, ধৈর্য (সবর) ব্যতীত তওবা সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয় না। এমন কি কোন ফরয কাজ সুচারুরূপে আদায় করা এবং পাপ পরিত্যাগ করা ধৈর্য ব্যতীত সম্ভবপর নহে। এই জন্যই রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে 'ঈমান কি জিনিস' জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি সবরকেই ঈমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অপর এক হাদীসে তিনি বলেন–"সবর ঈমানের অর্ধেক।"

সবরের এত অধিক ফযীলত যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা সত্তর বারেরও অধিক ইহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং মানুষের চরম উন্নতি সবরেই নিহিত আছে বলিয়াছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا -

অর্থাৎ "যখন তাহারা সবর করিয়াছে তখন আমি তাহাদের মধ্য হইতে নেতৃবৃন্দ সৃষ্টি করিয়াছি–তাহারা আমার আদেশে (অপরকে) সৎপথ প্রদর্শন করে।" (সূরা সিজদা, ৩ রুকূ, ২১ পারা।)

আল্লাহ তা'আলা সবরের জন্য অনন্ত পুরস্কার নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

অর্থাৎ "সবরকারিগণই তাদের অগণিত সওয়াব পরিপূর্ণভাবে পাইবে।" (সূরা যুমর, ২ রুকূ, ২৩ পারা।)

আবার আল্লাহ তা'আলা সবরকারীদের সহিত থাকিবার অঙ্গীকার করিয়া বলেন ঃ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ - অর্থাৎ "আর আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে (সহায়করূপে) আছেন।" (সূরা বাকারাহ্ ৩৩ রুকূ, ২ পারা।) আরও লক্ষ্য কর, আশীর্বাদ (সালাত), রহমত এবং হিদায়াত-এই তিনটি অমূল্য বস্তু সবরকারিগণকে ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা এক সঙ্গে অপর কাহাকেও দান করেন নাই। আল্লাহ বলেন ঃ

أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ - وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ -

অর্থাৎ 'এই সকল লোকের প্রতি তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আশীর্বাদ এবং রহমত। আর এই সকল লোক হিদায়াত প্রাপ্ত।" (সূরা বাকারাহ্, ১৯ রুকূ, ২ পারা)

সবরের অপর এক শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইহাকে বড় ভালবাসেন এবং তাঁহার প্রিয় বন্ধুগণকে ব্যতীত অপর কাহাকেও ইহা দান করেন না। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, "আল্লাহ তোমাদিগকে যে সকল বস্তু দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে সবর এবং ইয়াকীনই (দৃঢ় বিশ্বাস) মাত্রায় সবচেয়ে অল্প। যাহাদিগকে এই দুইটি জিনিস একত্রে প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, (নফল) নামায-রোযা অল্প মাত্রায় করিলেও তাহাদের কোন ভয় নাই। হে আমার বন্ধুগণ, আজ তোমরা যে অবস্থায় আছ যদি এই অবস্থায় ধৈর্যের সহিত স্থির থাক এবং এই অবস্থা হইতে ফিরিয়া না যাও, তবে আমার নিকট যত প্রিয় হইবে, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তোমাদের সকলের ইবাদত সমষ্টির সমান ইবাদত কর তথাপি তোমরা আমার নিকট তত প্রিয় হইবে না। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে যে, আমার (ওফাতের) পর দুনিয়ার পথ তোমাদের জন্য প্রশস্ত হইবে (অর্থাৎ দুনিয়ার উন্নতির পথ খোলা হইবে) এবং তোমাদের একজন অপর জনের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িবে ও ঈমানদার লোক তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। আর (সেই অবস্থায়) যে-ব্যক্তি সবর করিবে এবং (সবরের) সওয়াব পাইবার আশা রাখিবে, তাহাকে পূর্ণমাত্রায় সওয়াব দেয়া হইবে। (অতএব) তোমরা সবর কর; কেননা, দুনিয়া চিরকাল থাকিবে না। কিন্তু আল্লাহ্র প্রদত্ত সওয়াব চিরকাল থাকিবে।"

এই কথা বলিয়া রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিম্নলিখিত আয়াত শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলেন ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ - وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا -

অর্থাৎ "যাহা তোমাদের নিকট আছে, তাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে এবং আল্লাহর নিকট যাহা আছে, তাহা স্থায়ী থাকিবে। নিশ্চয়ই আমি তাহাদিগকে, যাহারা সবর করিতেছে, তাহাদের পুণ্যফল তাহারা যাহা করিত তাহা অপেক্ষা উত্তমরূপে দিব।" (সূরা নহল, ১৩ রুকূ, ১৪ পারা।)

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন-"বেহেশ্‌তের ধনভাণ্ডারসমূহের মধ্যে সবর একটি ধনভাণ্ডার।" তিনি অন্যত্র বলেন-"সবর মানুষ হইলে সে অত্যন্ত দয়ালু হইত।" তিনি আরও বলেন-"আল্লাহ তা'আলা সবরকারিগণকে ভালবাসেন।" ওহী যোগে হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামকে আদেশ দিলেন-"আমার স্বভাবের অনুকরণ কর। আমার স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, আমি সবরকারী।" হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেন-"অকৃতকার্য হইয়া যে-পর্যন্ত তোমরা সবর করিতে না পারিবে সে-পর্যন্ত সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আনসারদের এক দলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-"তোমরা কি ঈমানদার?" সেই কওমের লোকেরা নিবেদন করিল-"হাঁ, আমরা ঈমানদার।" হযরত (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, "(তোমরা যে মুমিন ইহার) নিদর্শন কি?" তাহারা আরয করিল-"আমরা নি'আমত পাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, দুঃখ কষ্টে সবর করি এবং আল্লাহ্র বিধানে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকি।" হযরত (সা) বলিলেন-"আল্লাহর শপথ, তোমরা পরিপক্ক মুসলমান।" হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন-"দেহের যেমন মস্তক থাকে ঈমানেরও তদ্রূপ মস্তক আছে; সবর ঈমানের মস্তক। মস্তক ব্যতীত যেমন দেহ হইতে পারে না, সবর ব্যতীত তদ্রূপ ঈমান থাকিতে পারে না।"

সবরের হাকীকত-সবর কেবল মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। অন্য জীবজন্তুর সবর নাই। এজন্যই ইহারা অসম্পূর্ণ। ফিরিশ্‌তাগণের পক্ষে সবরের আবশ্যকতা নাই; কেননা তাঁহারা কামিল এবং তাঁহাদের উপর প্রবৃত্তির কোন অধিকার নাই। পশুগণ প্রবৃত্তির বশীভূত এবং একমাত্র প্রবৃত্তির তাড়নায়ই ইহারা পরিচালিত

হইয়া থাকে। অপরদিকে ফিরিশ্‌তাগণ সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রেমে বিভোর থাকেন এবং এই পথে তাঁহাদের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। অতএব, প্রতিবন্ধকতা দূর করিবার কষ্টও তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হয় না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমত মানবকে পশু স্বভাব দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পানাহারের লোভ, সৌন্দর্যের লালসা ও খেলাধুলার অভিলাষ তাহার উপর চাপাইয়া দিয়েছেন। তৎপর যৌবনের প্রারম্ভে ফিরিশ্‌তাদের নূরের ন্যায় একটি নূর মানবের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং ইহার সাহায্যে সে কার্যের কারণ ও ফলাফল বুঝিতে পারে। বরং আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তখন দুইজন করিয়া ফিরিশ্‌তা পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন। পশুগণ এই সকল হইতে বঞ্চিত থাকে। উক্ত ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের একজন মানুষকে ভালমন্দ বুঝাইয়া দিয়া সৎপথ দেখাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ফিরিশ্‌তাদের নূরের সমশ্রেণীর একটি নূর মানবের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ইহার সাহায্যে যে কার্যকারণ ও শেষ পরিণাম অবগত হয়। ইহাছাড়া সে নিজের ও আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করে। সে আরও অবগত হয় যে, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কালে সাময়িক আনন্দ পাইলেও ইহাই পরিণামে বিনাশ ও ধ্বংসে নিপতিত করে; ইহার আরাম ও সুখ নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তজ্জনিত দুঃখকষ্টে বহুদিন পর্যন্ত যন্ত্রণা দিতে থাকে। এইরূপ বোধশক্তি প্রাণীর ভাগ্যে কখনো ঘটে না; শুধু মানুষের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু এইরূপ বোধশক্তি লাভ করাই মানবের পক্ষে যথেষ্ট নহে। কারণ, যে-ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে অনিষ্টকর বলিয়া বুঝিয়াছে, অথচ ইহাকে দমন করার ক্ষমতা তাহার নাই, এমতাবস্থায় তদ্রূপ উপলব্ধিতে তাহার কি লাভ? পীড়িত ব্যক্তি যদি বুঝে যে, পীড়া তাহার পক্ষে ক্ষতিকর, কিন্তু পীড়া দূর করিতে সে অসমর্থ, তবে এই জ্ঞান তাহার কি উপকার করিবে? এইজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা মানবের সহিত অপর এক ফিরিশ্‌তা নিযুক্তি করিয়া দিয়াছেন যেন মানুষ তাঁহার শক্তি ও সাহায্যে যাহাকে সে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করত ইহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে পারে। সুতরাং জন্মকাল হইতে খায়েশের (প্রবৃত্তির) অনুসরণ করিয়া চলিবার মানবের যেমন একটি শক্তি ছিল, যৌবনের প্রারম্ভে আল্লাহ্ তাহাকে তদ্রূপ আর একটি শক্তি প্রদান করিলেন যাহাতে সে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচারণ করত ভবিষ্যত ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। খায়েশের বিরুদ্ধাচরণ করিবার শক্তি ফিরিশ্‌তা-বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত এবং খয়েশের অনুসরণ করিয়া চলিবার শক্তি শয়তান-বাহিনীর অন্তর্গত। খায়েশের বিরুদ্ধাচরণ করিবার শক্তি ধর্ম-কর্মে প্রেরণা যোগায় এবং খায়েশের অনুসরণ করিয়া চলিবার শক্তিই প্রবৃত্তিকে কু-কর্মে প্ররোচনা দেয়।

মানবের অন্তররাজ্যে এই দুই পরস্পর-বিরোধী বাহিনীর সংঘর্ষ লাগিয়া রহিয়াছে। ফিরিশ্‌তা-বাহিনী মানবকে প্রবৃত্তির অনুসরণ হইতে বাধা প্রদান করে এবং শয়তান-বাহিনী তাহাকে প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে উত্তেজিত করে। মানব বেচারা এই দুই বিদ্যমান সৈন্যদলের টানা-হেঁচড়ার মধ্যে পড়িয়া কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণে হয়রান রহিয়াছে। শয়তান-সৈন্যের সহিত যুদ্ধকালে ফিরিশ্‌তা-সৈন্য যদি ধর্মপথে দৃঢ়পদ থাকে এবং নিজের স্থান হইতে হটিয়া না যায়, তবে এইরূপ দৃঢ়তা-স্থিরতাকে 'সবর' বলে। আবার স্বস্থানে স্থির থাকিয়া শয়তান-সৈন্যকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া দিতে পারিলে এই বিজয়কে 'যফর' বলে। মানুষের অন্তররাজ্যে শয়তান-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালু রাখাকেই 'জিহাদে নফস' অর্থাৎ প্রবৃত্তির সহিত জিহাদ বলে। ফলকথা, খাহেশের উত্তেজনার বিরুদ্ধাচরণে ধর্মপথে অটল অচল থাকাকেই সবর বলে। এই দুই বিরোধী সৈন্যদলের সংঘর্ষ যেখানে নাই, সেখানে সবরেরও আবশ্যকতা নাই। ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে ধর্ম-প্রেরণার বিরোধী শক্তি নাই। এইজন্য তাঁহাদের সবরেরও আবশ্যকতা নাই। আর পশু ও শিশুদের মধ্যে প্রবৃত্তি-বিরোধী শক্তি নাই বলিয়াই তাহাদের সবর করার শক্তিও নাই।

উপরে যে-দুই ফিরিশ্‌তার কথা বর্ণিত হইল তাহাদিগকেই 'কিরামান কাতিবীন' বলে। যাহাদের সম্মুখে আল্লাহ তা'আলা চিন্তা ও যুক্তি অনুসন্ধানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহারা বুঝিতে পারে যে, কারণ ব্যতীত কোন কার্যের উৎপত্তি হয় না এবং যে-স্থানে কোন নূতন বস্তু দেখা যায়, তথায় নূতন কারণের সমাবেশেই ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুইটি বিরোধী বস্তু পাওয়া গেলে বুঝা যাইবে যে, দুইটি বিরোধী কারণেই উহার উদ্ভব হইয়াছে। মানব দেখে যে, পশু ও শিশুগণ হিদায়াত ও মা'রিফাত (জ্ঞান) হইতে বঞ্চিত থাকে এবং এইজন্যই ইহারা ভাল-মন্দ পরিণাম বুঝিতে পারে না। আর ইহাদের সবরের ক্ষমতাও থাকে না। যৌবনের প্রারম্ভে মানব হিদায়াত ও মা'রিফাত লাভ করিয়া থাকে। এই দুইটি নূতন পদার্থ অবশ্যই দুই কারণের প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। উপরিউক্ত দুইটি ফিরিশ্‌তাই এই দুইটি কারণেরই অভিব্যক্তি। মানুষ তখন আরও জানে যে, হিদায়াতই মুখ্যবস্তু এবং প্রথমে হিদায়াত লাভ করিলে তদনুযায়ী আমল করিবার শক্তি ও ইচ্ছার উদ্ভব হইয়া থাকে। অতএব যে ফিরিশ্‌তার কারণে হিদায়াত হয়, তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। বক্ষের দক্ষিণ

পার্শ্বে তাঁহার স্থান। এ-স্থলে বক্ষ বলিতে তোমার নিজকেই বুঝায়; কেননা, ফিরিশ্‌তাদ্বয়কে তোমার পরিদর্শকরূপেই নিযুক্ত করা হইয়াছে।

হিদায়াত ও মা'রিফাত লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যদি তোমাকে সৎপথ প্রদর্শনের নিমিত্ত নিয়োজিত দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ফিরিশ্‌তার উপদেশ মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর, তবে তুমি তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিলে। কারণ, তুমি তাঁহাকে বেকার করিয়া রাখ নাই। তাহা হইলে তোমার আমলানামায় একটি পুণ্যও লেখা হইবে। পক্ষান্তরে তুমি যদি তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করত তাঁহাকে বেকার করিয়া দেও এবং পশু ও শিশুদের মত তুমি কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে বঞ্চিত থাক, তবে তুমি এই ফিরিশ্‌তা ও তোমার নিজের প্রতি অন্যায় করিলে এবং এই অন্যায়ের পাপ তোমার আমলানামায় লিপিবদ্ধ হইবে।

এইরূপে তুমি ফিরিশ্‌তা হইতে যে ক্ষমতা লাভ কর, তাহা যদি খায়েশের বিরুদ্ধাচরণে প্রয়োগ কর বা প্রয়োগের চেষ্টা কর, তবে সওয়াব পাইবে; অন্যথায় গুনাহ্ হইবে। এই পাপ-পুণ্য তোমার আমলনামায় ও তোমার মানসপটে লিপিবদ্ধ হইবে। কিন্তু মন ইহা জানিতে পারিবে না। এই দুই ফিরিশ্‌তা এবং তাঁহাদের লিখনের সহিত জড়-জগতের কোন সম্বন্ধ নাই। এইজন্য চর্মচক্ষে তাঁহাদিগকে দেখা যায় না। মৃত্যু ঘটিলে যখন চর্মচক্ষু আর থাকিবে না এবং আধ্যাত্মিক জগত দর্শনের উপযুক্ত চক্ষু উন্মীলিত হইবে, তখন এই পাপ-পুণ্যের আমলনামা তোমার সঙ্গেই দেখিতে পাইবে এবং কিয়ামতে সুগ্‌রা (ক্ষুদ্র কিয়ামত) সম্বন্ধে অবগত হইবে। কিন্তু ইহার বিস্তারিত বিবরণ কিয়ামতে কুব্‌রার দিন অর্থাৎ মহাবিচারের দিন জানিতে পারিবে। মৃত্যুই কিয়ামতে সুগরা যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهٗ – অর্থাৎ "যে যখন মরিল তখনই তাহার কিয়ামত হইল।" মহাকিয়ামতে যাহা ঘটিবে, ইহার আভাস মৃত্যুকালে ক্ষুদ্র কিয়ামতেও পাওয়া যায়। 'ইয়াহ্‌ইয়াউল উলূম' গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইহার সংকুলান হইবে না।

প্রবৃত্তির সহিত যুদ্ধে সবরের আবশ্যকতা– মোটের উপর কথা এই যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সবরের আবশ্যক এবং দুইটি বিরোধী সৈন্যদল থাকিলেই যুদ্ধ বাঁধে। মানবের অন্তররাজ্যে দুইটি বিপক্ষ সৈন্যদলের সমাবেশ রহিয়াছে। একটি দল ফিরিশ্‌তা-সৈন্য এবং অপরটি শয়তান-সৈন্য। এই দুই দলে যুদ্ধ বাধিলে ইহাতে

লিপ্ত হওয়া ধর্মপথের প্রথম পদবিক্ষেপ। কারণ, শৈশবকাল হইতে মানবের হৃদয়রাজ্য শয়তান-সৈন্যের অধিকৃত এবং যৌবনের প্রারম্ভে মাত্র ফিরিশ্‌তা-সৈন্যের উৎপত্তি হয়। অতএব শয়তান-সৈন্যদলকে পরাজিত না করিলে সৌভাগ্য লাভ করা যায় না। সবরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত না হইলে ইহাকে পরাস্ত করা চলে না। তাই যে-ব্যক্তি এই যুদ্ধে ব্যাপৃত হয় না, সে আপন অন্তর-রাজ্যটি শয়তানের হস্তে সমর্পণ করে। অপরপক্ষে যে-ব্যক্তি নিজের খায়েশকে পরাভূত করিয়া লইল, সে শরীয়তের আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িল এবং নিজের হৃদয়-রাজ্যটি দখল করিয়া লইতে সমর্থ হইল। যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَانَنِيْ عَلٰى شَيْطَانِىْ فَاَسْلَمَ –

অর্থাৎ "কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে আমার শয়তানের উপর জয়ী হইতে সাহায্য করিয়াছে। তৎপর সে মুসলমান হইয়া পড়িয়াছে।"

মানব স্বীয় প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধে কখনও পরাস্ত হয়, আবার কখনও জয়ী হইয়া থাকে। এইরূপে তাহার অন্তর-রাজ্যটি কখনও প্রবৃত্তির অধীনে, আবার কখনও-বা শরীয়তের অধীনে থাকে। কিন্তু সবর করিতে না পারিলে এবং অচল অটলভাবে স্থির থাকিতে না পারিলে হৃদয়-রাজ্য দখলে রাখা যায় না।

সবর অর্ধ ঈমান ও রোযা অর্ধ সবর হওয়ার কারণ– ঈমান একটি একক পদার্থ নহে, বরং ইহা নানা প্রকার এবং বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। এইজন্যই হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, ঈমান সত্তরেরও অধিক অংশে বিভক্ত। ইহার শ্রেষ্ঠতম অংশ কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এবং পথিকের কষ্ট দূর করিবার উদ্দেশ্যে রাস্তা হইতে খড়কুটা সরাইয়া দেওয়া ইহার ক্ষুদ্রতম অংশ। ঈমান নানা ভাগে বিভক্ত এবং ইহার শাখা-প্রশাখা বহু হইলেও ইহার প্রকৃত সত্তা তিন ভাগেই বিভক্ত; যথা ঃ–(১) পরিচয় জ্ঞান, (২) মনের অবস্থা এবং (৩) আমল (অনুষ্ঠান)। ঈমানের সর্বস্তরে এই তিনটি বস্তু অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ তওবার বিষয় ভাবিয়া দেখ। তওবার হাকীকত হইল অনুশোচনা। ইহা মনের একটি অবস্থা। পাপ যে বিষের ন্যায় প্রাণ-সংহারক এবং পাপ বর্জন করত ইবাদতে লিপ্ত থাকিলে ইহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এই জ্ঞান হইতেই মনের তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। এ-স্থলে পাপের পরিচয় জ্ঞান, অন্তরের

অনুতপ্ত অবস্থা এবং আমল (সৎকার্যের অনুষ্ঠান), এই তিনটির সমাবেশের নাম ঈমান। ঈমান এই তিনটি বিষয়েরই অভিব্যক্তি। তথাপি ঈমান বলিতে কোন কোন সময় কেবল পরিচয় জ্ঞানকেই বিশেষরূপে বুঝায়; কেননা ইহাই মূল বস্তু এবং ইহার প্রভাবেই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হয় ও তৎপর তদনুযায়ী আমল (কার্য) হইয়া থাকে। সুতরাং পরিচয়-জ্ঞান হইল ঈমানরূপ বৃক্ষের কাণ্ড ; এই জ্ঞানের প্রভাবে হৃদয়ের যে অবস্থান্তর ঘটে, ইহাকে শাখা এবং পরিবর্তিত মানসিক অবস্থার প্রভাবে যে সৎকার্য অনুষ্ঠিত হয়, ইহাকে এই বৃক্ষের ফল বলা চলে।

আবার গোটা ঈমানকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা ঃ– দীদার (দর্শন লাভ) এবং কির্‌দার (আমল বা কার্য)। সবর ব্যতীত কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এইজন্য সবরকে ঈমানের অর্ধেক বলা চলে। দুই শ্রেণীর প্রতিবন্ধকতার জন্য মানুষের পক্ষে সবর করা আবশ্যক। এক শ্রেণী হইল বাসনা-কামনা, লোভ-লালসা এবং অপর শ্রেণী ক্রোধ। রোযা রাখিলে বাসনা-কামনার উত্তেজনার বিরুদ্ধে সবর করা হয় বলিয়া রোযাকে অর্ধেক সবর বলা হয়।

অপরদিকে সবরকে অর্ধেক ঈমান বলা হইয়াছে। কার্যই দেখা হয় এবং কার্যেই ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখ-কষ্টের সময় সবর করা এবং নি'আমত পাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মুসলমানের কাজ। এইজন্যই ঈমানের একভাগ সবর এবং অপর ভাগ শুকর (কৃতজ্ঞতা)। এই মর্মে অন্য হাদীস বর্ণিত আছে।

প্রিয় পাঠক, তুমি যদি সবরকে অত্যন্ত কঠিন ও নিতান্ত দুষ্কর ভাবিয়া ইহাকেই মূল ঈমানরূপে ধরিয়া লও, তবে সবর অপেক্ষা দুঃসাধ্য কাজ আর কিছুই দেখিবে না। কারণ, হাদীস শরীফে সবরকে গোটা ঈমান বলা হইয়াছে। যেমন সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করিলেন–"ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঈমান কি বস্তু?" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, "সবর।" অর্থাৎ ঈমানের মধ্যে সবর অপেক্ষা কঠিন আর কিছুই নাই। হজ্জ সম্বন্ধে বলিতে যাইয়াও রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একস্থানে ঠিক এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। হজ্জের প্রধানতম কাজটিকেই গোটা হজ্জ বলিয়াছেন; যেমন, তিনি 'আরফাকে' হজ্জ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, আরফার কার্যগুলি সুসম্পন্ন না হইলে হজ্জ বাতিল হয়, কিন্তু অন্য কাজ ছুটিয়া গেলে হজ্জ বিনষ্ট হয় না। ঈমানের বেলায় সবরের অবস্থাও ঠিক এইরূপ।

সর্বদা সবরের আবশ্যকতা–প্রবৃত্তির স্বপক্ষ বা বিপক্ষ ভাব বা বস্তু হইতে মানব-মন কখনও শূন্য হইতে পারে না। সুতরাং এই উভয় অবস্থায়ই তাহার জন্য সবরের আবশ্যকতা রহিয়াছে।

অভিলষিত বস্তু সম্পর্কে সবরের আবশ্যকতা– ধন-দৌলত, মান-সম্মান, স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদি মানুষ পাইতে চায়। সুতরাং এই সকল বাঞ্ছিত বস্তু হইতে সবর করা অন্যান্য বিষয়ে সবর করা অপেক্ষা অধিক আবশ্যক। প্রবৃত্তির প্রলোভন হইতে নিজেকে রক্ষা না করিয়া দুনিয়ার ধনসম্পদ ও আরাম-আয়াশে লিপ্ত হইলে মন উহাতেই আবদ্ধ হইয়া পড়িবে এবং মানব হৃদয় গর্বিত ও অবাধ্য হইয়া উঠিবে। বুযুর্গগণ বলেন–"দুঃখ-কষ্টের সময় ত সকলেই সবর করে; কিন্তু সুখের সময় সিদ্দীকগণ ব্যতীত আর কেহই সবর করে না।" সাহাবাগণের (রা) সম্পদ বৃদ্ধি পাইলে এবং পর্যাপ্ত ধন জমা হইলে তাঁহারা বলিতেন–"আমরা যে পর্যন্ত দুঃখ-কষ্টে ছিলাম সে পর্যন্ত সবরকারী ছিলাম। এখন সম্পদ ও ক্ষমতা পাওয়ার পর আমরা পূর্বের ন্যায় সবর করিতে পারি না।" এইজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ –

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তোমাদের ধন এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) ফিত্‌না (পরীক্ষা)।" (সূরা তাগাবুন, ২ রুকূ, ২৮ পারা।) মোটকথা এই যে, ধন ও ক্ষমতা লাভ করিয়া সবর করা নিতান্ত দুষ্কর। যাহাকে আল্লাহ্ ধন ও প্রভুত্ব দান করেন না, কিন্তু সে সবর করিতে পারে, এমন ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক স্বীয় আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। সম্পদের প্রতি আসক্ত না হওয়া, ইহার কারণে আমোদ-আহলাদ না করা, ইহাকে ধার করা পদার্থের ন্যায় বিবেচনা করত শীঘ্রই ফিরাইয়া দিতে হইবে বলিয়া মনে করা, এমন কি ইহাকে হিতকর বলিয়া মনে না করিয়া বরং ইহার কারণে পরকালে উচ্চমর্যাদা লাভে বঞ্চিত থাকিতে হইবে বলিয়া বিবেচনা করাই সম্পদে সবর। আর ধন, স্বাস্থ্য ইত্যাদির যাবতীয় সম্পদ লাভ করত যে আল্লাহ অনুগ্রহপূর্বক উহা দান করিয়াছেন তৎপ্রতি কর্তব্য পালনার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে লিপ্ত হওয়া উচিত। উপরিউক্ত প্রত্যেকটি স্থলেই সবরের আবশ্যকতা আছে।

প্রবৃত্তি-বিরুদ্ধ বস্তু সম্পর্কে সবরের আবশ্যকতা–প্রবৃত্তি-বিরুদ্ধ বস্তু তিন প্রকারের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এক প্রকারের বস্তু মানবের ক্ষমতার মধ্যে আছে; যথাঃ–ইবাদত করা বা পাপ পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় প্রকারের বস্তুসমূহের উপর মানুষের কোন ক্ষমতা নাই; যেমন, বিপদাপদ ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকারের বস্তুগুলির উৎপত্তির মূল কারণের উপর কাহারও হাত নাই। কিন্তু উহার প্রতিশোধ লওয়া এবং ইহা দমন করার ক্ষমতা মানুষের আছে; যথা–অপরের প্রদত্ত দুঃখকষ্ট।

প্রথম প্রকারের বস্তু যাহা মানুষের আয়ত্তে আছে, তন্মধ্যে ইবাদত কার্য সম্পন্ন করিবার সময় সবর করা নিতান্ত আবশ্যক। কেননা, কোন কোন ইবাদত আলস্যের কারণে দুষ্কর হইয়া উঠে; যেমন নামায, হজ্ব প্রভৃতি। সবর ব্যতীত এই সমস্ত ইবাদত করা সম্ভবপর নহে। প্রত্যেক ইবাদতের জন্যই ইহার আদিতে এবং অন্তে সবরের আবশ্যক। ইবাদতের প্রারম্ভেই একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত করার নিয়ত এবং অন্তর হইতে রিয়া বিদূরিত করিয়া লইতে হয়। এই সবর নিতান্ত দুঃসাধ্য। ইবাদত করিবার কালে ইহা যথা-নিয়মে আদবের সহিত সম্পন্ন করিবার জন্য সবরের দরকার, যাহাতে শরীয়ত-বিরুদ্ধ কোন কাজের দরুন ইবাদত ত্রুটিপূর্ণ না হয়। যেমন নামায পড়িবার সময় এ-দিক সেদিক দৃষ্টিপাত না করা এবং সাংসারিক কোন বস্তুর চিন্তা না করা। ইবাদত কার্য শেষ করিয়া ইহা প্রকাশের লোভ ও অহংকার দমনের জন্য সবরের নিতান্ত প্রয়োজন। আবার সবর ব্যতীত গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকাই যায় না। পাপের ইচ্ছা যত প্রবল এবং ইহা করা যত সহজ, ধৈর্য ধারণপূর্বক ইহা হইতে বিরত থাকা তত কঠিন। এইজন্যই রসনার পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকা বড় কঠিন। কেননা, রসনা সঞ্চালন করা নিতান্ত সহজ। মন্দকথা বলিতে মানুষ ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। মন্দকথা শয়তানের সৈন্যের অন্তর্গত। এই কারণেই মিথ্যা বলা, আত্ম-প্রশংসা ও অপরকে ভর্ৎসনা করিবার কালে রসনা অতি দ্রুতবেগে চলিতে থাকে। যে কথা শুনিলে অন্য লোকে চমৎকৃত হয় বা কান পাতিয়া শুনিতে ভালবাসে, তদ্রূপ কথা হইতে বক্তাকে বিরত থাকিতে হইলে অতিকষ্টে তাহাকে ধৈর্য অবলম্বন করিতে হয়। আর মজলিসে বসিলে এইরূপ খোশ বাক্যালাপ হইতে বিরত থাকা অসম্ভবই হইয়া উঠে। কিন্তু নির্জন বাস অবলম্বন করিলে মানুষ এইরূপ আপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।

প্রবৃত্তি-বিরুদ্ধ দ্বিতীয় প্রকারের বস্তু যাহার উপর তাহার কোন হাত নাই–যেমন অপরের হস্ত ও বাক্য দ্বারা কষ্ট প্রদান–এমন কি প্রতিশোধ গ্রহণে সমর্থ হইলেও এরূপ স্থলে পূর্ণ সবরের আবশ্যক। এই সকল স্থানে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না লওয়া বা প্রতিশোধ গ্রহণের সময়-সীমা অতিক্রম না করার জন্য পূর্ণ সবরের আবশ্যকতা রহিয়াছে। একজন সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"ঈমানদার লোকের পক্ষে অপরের প্রদত্ত দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা না থাকিলে এমন ঈমানকে আমরা (পূর্ণ) ঈমান বলিয়া মনে করি না।" এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ

دَعْ اَذٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ –

অর্থাৎ "তাহাদের প্রদত্ত কষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবেন না এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করুন।" (সূরা আহযাব, ৬ রুকূ, ২২ পারা।) অন্যত্র আল্লাহ্ বলেনঃ

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا –

অর্থাৎ "তাহারা যাহা বলিয়া থাকে তাহাতে আপনি সবর করুন এবং সৎভাবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিন।" (সূরা মুয্যাম্মিল, ১ রুকূ, ২৯ পারা।) আল্লাহ্ পুনরায় বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি জানি যে, তাহারা যাহা বলিতেছে তজ্জন্য আপনার অন্তঃকরণ সঙ্কীর্ণ হইতেছে। অনন্তর আপনি স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা প্রশংসাসহ বর্ণনা করুন।" (সূরা হাজর, ৬ রুকূ, ১৪ পারা।)

একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম গরীব-দুঃখীদের মধ্যে ধন বিতরণ করিতেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল–"এ-বিতরণ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হইতেছে না।" অর্থাৎ ন্যায়বিচারের সহিত বিতরণ

করা হইতেছে না। না'উযুবিল্লাহি মিন যালিক। ইহা শুনিয়া হযরতের (সা) নূরানী চেহারা লোহিত বর্ণ ধারণ করিল এবং দুঃখের সহিত তিনি বলিলেন–"আমার ভাই মূসার (আ) উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক। লোকে তাহাকে আমা অপেক্ষা অধিক কষ্ট দিয়াছিল। কিন্তু তিনি উহা সহ্য করিয়াছিলেন।" আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ - وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ -

অর্থাৎ "আর যদি তোমরা প্রতিশোধ লও তবে সেই পরিমাণ প্রতিশোধ লও যেরূপ তোমাদিগকে কষ্ট দিয়াছে। আর যদি (প্রতিশোধ না লইয়া) সবর কর তবে অবশ্য উহা সবরকারীদের জন্য উত্তম।" (সূরা নহল, ১৬ রুকূ, ১৪ পারা।)

ইঞ্জিল কিতাবে আছে যে, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলিয়াছেন–"যে-সকল পয়গম্বর আমার পূর্বে আগমন করিয়াছিলেন, 'হস্তের পরিবর্তে হস্ত কাটিয়া ফেল, চক্ষুর পরিবর্তে চক্ষু নষ্ট কর, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত ভাঙ্গিয়া দাও।' আমি তাঁহাদের এই বিধান রহিত করিতেছি না। কিন্তু আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি যে, অনিষ্টের পরিবর্তে অনিষ্ট করিও না; বরং কেহ তোমার ডান গালে চড় মারিলে তুমি তাহার নিকট বাম গাল ফিরাইয়া দিয়া বল–'ভাই, এই গালেও একটি চড় লাগাইয়া দাও।' কেহ তোমার পাগড়ী কাড়িয়া লইলে তোমার জামাটিও তাহাকে দিয়া দাও। কেহ তোমাকে বিনা পারিশ্রমিকে এক মাইল লইয়া গেলে তুমি তাহার সহিত দুই মাল চলিয়া যাও।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাহাকে দান কর। যে তোমার অনিষ্ট করে, তুমি তাহার মঙ্গল কর।" কিন্তু সিদ্দীকগণ ব্যতীত অপর কেহই এইরূপ সবর করিতে পারে না।

প্রবৃত্তি-বিরুদ্ধ তৃতীয় প্রকারের বস্তু পরিহার করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। ইহা হইল আসমানী বিপদাপদ। আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত কোন স্থানেই ইহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই; যেমন–সন্তান-সন্ততির মৃত্যু, ধনের বিনাশ, চক্ষু-কর্ণ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যংগের ক্ষতি এবং আসমানী বালা-মসীবত। এবংবিধ বিপদাপদে সবরে যত সওয়াব ও ফযীলত আছে, অন্য কোন সবরে তত নাই।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, কুরআন শরীফে তিন প্রকার সবরের কথা বর্ণিত আছে। প্রথম, ইবাদতে সবর; ইহার সওয়াবের তিন শত সোপান। দ্বিতীয়, হারাম পরিত্যাগে সবর; ইহার সওয়াবের ছয় শত সোপান। তৃতীয়, বিপদাপদে সবর; ইহার সওয়াবের নয় শত সোপান। সিদ্দীকগণের মর্তবায় উপনীত না হইলে কেহই বিপদাপদে সবর করিতে পারে না। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন–"আমি যাহাকে রোগগ্রস্ত করি, সে যদি সবর করে এবং অপরের সম্মুখে এই রোগের অভিযোগ না করে, তবে সুস্থ করিলে এই সবরের বিনিময়ে তাহাকে আমি পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট চর্ম-মাংস দান করি। আর তাহাকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লইলে আমার রহমতের সহিত উঠাইয়া লইয়া থাকি।" হযরত দাউদ আলায়হিস সালাম আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ, যে ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া একমাত্র তোমার জন্য সবর করে, ইহার প্রতিদানে যে কি পাইবে?" উত্তরে আল্লাহ বলেন– "আমি তাহাকে ঈমানের পরিচ্ছদ পরাইয়া দেই এবং কখনও ইহা ফিরাইয়া নেই না।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"সবরের সহিত সচ্ছলতা ও শান্তি প্রতীক্ষায় থাকা ইবাদত।" তিনি অন্যত্র বলেন–"যে ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করে, আল্লাহ তাহার দু'আ কবূল করিয়া থাকেন। দু'আ এই–

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاَعْقِبْنِىْ خَيْرًا مِّنْهَا -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁহারই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তন করিব। ইয়া আল্লাহ, আমার বিপদের প্রতিদান দাও এবং ইহার বিনিময়ে আমাকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত কর।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ্ হযরত জিব্‌রাঈল আলায়হিস্ সালামকে বলিয়াছেন–হে জিব্‌রাঈল, আমি যাহার দৃষ্টিশক্তি হরণ করি, ইহার বিনিময়ে আমি তাহাকে কি দান করিয়া থাকি, তাহা তুমি জান কি? ইহার বিনিময় এই যে, আমি তাহাকে আমার দর্শন (দীদার) দান করি।"

এক বুযুর্গ এক টুকরা কাগজে নিম্নলিখিত আয়াত লিখিয়া রাখিয়াছিলেন এবং কোন বিপদে পড়িলেই পকেট হইতে বাহির করিয়া তিনি ইহা দেখিতেন। আয়াত এই ঃ

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا -

অর্থাৎ "আর আপনি স্বীয় প্রভুর আদেশের জন্য সবর করুন। অনন্তর নিশ্চয়ই আপনি আমার চক্ষুর সম্মুখে আছেন।" (সূরা তূর, ২ রুকূ, ২৭ পারা) হযরত ফতেহ্ মুসেলীর (র) পত্নী একদা আছাড় খাইলেন ইহাতে তাঁহার একটি অঙ্গুলী ভাংগিয়া গেল। কিন্তু তিনি হাসিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল– "আপনার আংগুলে কি বেদনা হইতেছে না?" উত্তরে তিনি বলিলেন–"সওয়াবের আনন্দে আমি বেদনা ভুলিয়া গিয়াছি।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, রোগে অভিযোগ না করা এবং বিপদ গোপন রাখা আল্লাহকে মহান বলিয়া জানার অন্যতম নিদর্শন। এক রাবী বলেন যে, তিনি হযরত আবূ হুযায়ফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনিব হযরত সালিম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে রণক্ষেত্রে আহত অবস্থায় ভূপতিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"আপনি পানি চাহেন কি?" তিনি উত্তরে বলেন–"আমাকে পায়ে ধরিয়া টানিয়া নিয়া শত্রুর নিকটবর্তী করিয়া রাখুন এবং আমার ঢালে পানি রাখিয়া দিন। কারণ, আমি রোযা রাখিয়াছি,; সূর্যাস্ত পর্যন্ত জীবিত থাকিলে পানি পান করিব।"

রোদনে বা দুঃখিত হওয়াতে সওয়াব নষ্ট হয় না–বিপদে পতিত হইয়া রোদন করিলে বা দুঃখিত হইলে সবরের সওয়াব নষ্ট হয় না। কিন্তু শোকে অধীর হইয়া পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন করিলে, চীৎকার করিয়া রোদন করিলে এবং অতিমাত্রায় অভিযোগ করিলে সওয়াব নষ্ট হইয়া যায়। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পুত্র হযরত ইব্‌রাহীম রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু ইন্তিকাল করিলে হযরত (সা) কাঁদিতে লাগিলেন দেখিয়া সাহাবাগণ (রা) নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি ত রোদন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" হযরত (সা) বলিলেন– "এই ক্রন্দন স্নেহের নির্দশন। স্নেহশীল ব্যক্তির প্রতিই আল্লাহ দয়া করিয়া থাকেন।" বুযুর্গগণ বলেন–"কাহারও উপর বিপদ পড়িলে শোকের কারণে তাহার বাহ্য আকৃতিতে যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে, তবে এমন সবরকে সব্‌রুন্ জমীল (সর্বাঙ্গসুন্দর সবর) বলে।"

শোকের সময় হারাম আচরণ–দুঃখে অস্থির হইয়া পরিধানের বস্ত্র ছিন্ন করা, মুখে চাপড় মারা এবং চীৎকার করিয়া রোদন করা হারাম। এমন কি শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিজের বাহ্য অবস্থা পরিবর্তন করা, চাদর দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রাখা বা পাগড়ী ছোট করা ইত্যাদিও সঙ্গত নহে। বরং তোমার মনে করা উচিত যে, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতীক্ষা না করিয়া স্বীয় অভিপ্রায়ে যাহাকে ইচ্ছা সৃজন করেন বা দুনিয়া হইতে উঠাইয়া লন। এমতাবস্থায় তাঁহার মঙ্গলময় বিধানে অসন্তুষ্ট হওয়া কাহারও পক্ষে উচিত নহে।

সবরের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত–হযরত আবূ তাল্‌হা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর পত্নী হযরত রমীযা উম্মে সলীম রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন–"আমার স্বামী বাহিরে গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমার পুত্র ইন্তিকাল করেন। আমি তাহার মুখ চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখিলাম। আমার স্বামী ফিরিয়া আসিয়া পীড়িত পুত্রের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম–'অন্যান্য রাত্র অপেক্ষা আজ বেশ ভাল।' তৎপর আমি খাদ্য দ্রব্য আনয়ন করিলাম। আমার স্বামী আহার করিলেন। আমি নিজ দেহকে অন্যান্য রজনী অপেক্ষা অধিক সুন্দর সাজে সজ্জিত করিলাম। এমন কি স্বামী আমার সহিত কাম-বাসনা চরিতার্থ করিলেন। তৎপর আমি স্বামীকে বলিলাম–'আমি অমুক প্রতিবেশীকে একটি দ্রব্য ধারস্বরূপ দিয়াছিলাম। আমি যখন ইহা ফেরত চাহিলাম তখন সে কাঁদিতে লাগিল।' আমার স্বামী বলিলেন–'বড় আশ্চর্যের কথা! এমন প্রতিবেশী নিতান্ত নির্বোধ।' পরিশেষে আমি স্বামীকে বলিলাম–'তোমার কনিষ্ঠ পুত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপঢৌকনস্বরূপ একটি ধার-করা বস্তুর ন্যায় তোমার নিকট ছিল। এখন তিনি এই শিশুকে ফেরত লইয়াছে।' ইহা শুনিয়া স্বামী বলিলেন-

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁহারই দিকে আমরা ফিরিয়া যাইব। প্রাতে তিনি সমস্ত ঘটনা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করিলেন। হযরত (সা) বলিলেন–'গত রাত্রিকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য শুভ করুক। কি উত্তম রজনী ছিল!' হযরত (সা) আবার বলিলেন–'আবূ তাল্‌হার (রা) পত্নী রমীযাকে (রা) আমি বেহেশ্‌তে দেখিয়াছি।"

এ-পর্যন্ত যাহা বলা গেল ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, প্রত্যেক অবস্থায়ই মানুষের পক্ষে সবরের আবশ্যকতা রহিয়াছে।

বেহুদা চিন্তা হইতে অব্যাহতির উপায়–মানুষ সকল বাসনা-কামনা হইতে অব্যাহতি পাইয়া নির্জনবাস অবলম্বন করিলেও শত সহস্র বেহুদা চিন্তা ও অমূলক খেয়াল হৃদয়ে উদিত হইয়া তাহাকে আল্লাহ্‌র যিকির হইতে বিরত রাখে। এই সকল চিন্তা নির্দোষ হইলেও মানব জীবনের পুঁজিস্বরূপ পরমায়ু বৃথা অপচয় করিয়া তাহার বিরাট ক্ষতি করে। নামাযের মধ্যে এইরূপ চিন্তা আসিলে এই দিকে মনোযোগ না দিয়া বরং নিবিষ্টচিত্তে সুন্দরভাবে নামায আদায় করিবার প্রবল চেষ্টা করিতে হইবে। বেহুদা চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য মানুষকে এমন কাজে লিপ্ত হইতে হয় যাহা মনকে তদ্রুপ চিন্তা হইতে টানিয়া নিজের দিকে ব্যাপৃত করিতে পারে।

হাদীস শরীফে আছে যে, চিন্তাশূন্য যুবককে আল্লাহ্ শত্রু বলিয়া মনে করেন। ইহা এই উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, যে-যুবক অবসর বসিয়া থাকে, সে বেহুদা চিন্তা হইতে অব্যাহতি পায় না এবং শয়তান তাহার নিকটেই অবস্থান করে ও অমূলক খেয়াল তাহার মনে স্বীয় গৃহ তৈয়ার করিয়া লয়। আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারাও বেহুদা চিন্তা হইতে অব্যাহতি না পাইলে উহা হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত কোন ব্যবসা বা চাকরি অবলম্বন করা উচিত। এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে নির্জনে বসিয়া থাকা সঙ্গত নহে। বরং যে-ব্যক্তি মনকে কাজে লাগাইতে পারে না, তাহার উচিত দেহকে কাজে লিপ্ত রাখা।

সবর অবলম্বনের উপায়–সবর অবিভাজ্য বস্তু নহে; বরং ইহা বহু ভাগে বিভক্ত। সবর অবলম্বনের ব্যাপারে ইহার প্রত্যেক বিভাগেই নূতন নূতন কাঠিন্য ও ক্লেশের সম্মুখীন হইতে হয় এবং প্রত্যেকটির প্রতিকারও পৃথক পৃথক আছে। তথাপি জ্ঞান ও অনুষ্ঠানমূলক উপায়ই উহার প্রকৃষ্ট প্রতিকার। বিনাশন খণ্ডে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই সবর অবলম্বনের উপায়। কিন্তু এ-স্থলে উদাহরণস্বরূপ একটি ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হইবে, যেন ইহাকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ও কার্যে আবশ্যকমত লোকে তদনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ধর্মপ্রেরণার সংঘর্ষ বাঁধিলে যদি ধর্মপ্রেরণা অটল থাকে, তবে ইহাকে সবর বলে। ইহা ধর্ম ও প্রবৃত্তি, এই দুইয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধাইয়া দিয়া যে-ব্যক্তি একটিকে জয়ী করিবার ইচ্ছ করে, তাহার উচিত যে, যাহাকে বিজয়ী করিবার ইচ্ছা থাকে, ইহাকে বল ও সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করা এবং যাহাকে পরাস্ত করিবার ইচ্ছা থাকে, ইহাকে দুর্বল করিয়া দেওয়া এবং ইহার সাহায্য প্রাপ্তির পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া।

প্রবৃত্তি দমন করা আবশ্যক–কাহারও হৃদয়ে কামভাব যদি এত প্রবল হইয়া উঠে যে, কাম-বাসনা চরিতার্থ না করিয়া থাকিতে সে অক্ষম হয়, তবে সম্ভবপর হইলে স্বীয় চক্ষুকে কুদৃষ্টি হইতে এবং হৃদয়কে তদ্রূপ খেয়াল হইতে বাঁচাইয়া রাখা তাহার কর্তব্য। ইহা না পারিলে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে কামভাব দুর্বল হইয়া পড়ে।

তিনটি উপায়ে কামভাবকে দুর্বল করা যায়।

প্রথম উপায়–যদি বুঝা যায় যে, উপাদেয় খাদ্য হইতে কামভাব প্রবল হইতেছে, তবে ঐরূপ খাদ্য ভক্ষণ করিয়া ইহাকে আর সাহায্য করিবে না। রোযা রাখিতে আরম্ভ করিবে এবং রজনীতে অল্প পরিমাণে শুষ্ক রুটি আহার করিবে; গোশ্‌ত ও বলকারক খাদ্য কখনও ভক্ষণ করিবে না।

দ্বিতীয় উপায়–যে সকল কারণে কাম-বাসনা উত্তেজিত হইয়া উঠে, উহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে। সুন্দর মূর্তি দর্শনে যদি কামাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তবে নির্জনবাস অবলম্বন করিবে। হারাম দর্শন হইতে স্বীয় চক্ষুকে হেফাযতে রাখিবে এবং যে-স্থানে যুবক-যুবতীর সমাগম হয়, সেখানে কখনও দণ্ডায়মান হইবে না।

তৃতীয় উপায়–হালাল উপায়ে কাম-বাসনা শান্ত করিবে যেন হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার। বিবাহ দ্বারা হালাল উপায়ে কামভাব শান্ত হইতে পারে। বিবাহ ব্যতীত অধিকাংশ লোক হারাম কামভাব হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

প্রবৃত্তি অবাধ্য পশুতুল্য। পশুকে বশীভূত করিতে হইলে উহার আহার বন্ধ করিয়া দিতে হয় বা উহার দৃষ্টি হইতে আহার একেবারে সরাইয়া রাখিতে হয় অথবা যে-পরিমাণ আহার দিলে ইহা শান্ত থাকে, সেই পমিরাণ দিতে হয়। প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিতেও এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে হয়। এ পর্যন্ত প্রবৃত্তিকে দুর্বল করিবার উপায় বর্ণিত হইল।

ধর্মপ্রেরণাকে শক্তিশালী করা আবশ্যক–দুই উপায়ে ধর্মপ্রেরণাকে বলবান করিয়া তোলা যায়। **প্রথম উপায়**–প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিলে যে উপকার হয়, মনকে ইহার প্রলোভন প্রদান এবং প্রবৃত্তির প্রলোভনের বিরুদ্ধে সবর

করিলে যে-সওয়াব পাওয়া যায়, ইহা যে সকল হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে তৎপ্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করা। প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইলে যে-সুখ লাভ হয়, তাহা নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী এবং প্রবৃত্তির প্রলোভনে সবর করিলে ইহার বিনিময়ে চিরস্থায়ী রাজত্বের অধিকারী হওয়া যায়, এই বিশ্বাস যত দৃঢ় হইবে, ধর্মপ্রেরণাও তত বলবান হইয়া উঠিবে। **দ্বিতীয় উপায়**–ধর্মপ্রেরণাকে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিবে; তাহা হইলে ইহা সাহসী হইয়া উঠেবে। কোন ব্যক্তি বলবান হইতে চাহিলে স্বীয় ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং বলসাধ্য কাজ করা তাহার উচিত। এইরূপ করিলে সে ক্রমশ বলবান হইয়া উঠিবে। যে-ব্যক্তি তাহা অপেক্ষা অধিক বলবান ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে চাহে, সর্বাগ্রে তাহার অপেক্ষা দুর্বল ব্যক্তির সহিত কুশ্‌তি করিয়া নিজ শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। কেননা এই উপায়েই শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই কারণেই যাহারা শ্রমসাধ্য কাজ করে, তাহারা ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হইয়া ওঠে। সবর সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে সবর করিয়া চলিলে ক্রমশ গুরুতর কাজেও সবর করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

শুক্‌র (কৃতজ্ঞতা)

শুক্‌রে ফযীলত–শুক্‌র একটি শ্রেষ্ঠ স্তর। ইহার মর্তবা অত্যন্ত উচ্চ এবং যে-সে লোক এই উন্নত মর্তবায় পৌঁছিতে পারে না। এইজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ –

অর্থাৎ "আমার বান্দাগণের মধ্যে অল্প লোকই শুক্‌র করে।" (সূরা সাবা, ২ রুকূ, ২২ পারা।) শয়তান মানুষের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিল ঃ

وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ –

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তাহাদের (মানুষের) অধিকাংশকেই তুমি কৃতজ্ঞ পাইবে না।" (সূরা আ'রাফ, ২ রুকূ, ৮ পারা।)

যে-সকল গুণে মানুষ পরিত্রাণ পায়, উহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহার প্রথম শ্রেণীর গুণ ধর্মপথে চলিবার সূচনাস্বরূপ মাত্র। এই শ্রেণীর গুণ অর্জন করা মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে; যেমন–তওবা, সবর, আল্লাহ্‌র ভয়, যুহ্‌দ (সংসারের প্রতি উদাসীনতা), দরিদ্রতা, মুহাসাবা (কৃতকর্মের হিসাব নিকাশ)। এই গুণগুলি উহাদেরও বহু ঊর্ধ্বে এক বিরাট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সহায়ক মাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর গুণসমূহ অপর কোন কাজের সূচনা বা সহায়করূপে নহে, বরং স্বয়ং ঐগুলি অর্জন করাই মানব জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য; যেমন মহব্বত, শওক (আল্লাহ্‌র দীদার লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকা), রেযা (সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট থাকা), তাওহীদ, তাওয়াক্কুল এবং শুক্‌রও এই শ্রেণীর গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। যাহা স্বয়ং মানুষের কাম্য, তাহাই আখিরাতেও তাহার সঙ্গে থাকিবে এবং শুক্‌রও মানুষের চিরসহচররূপে বিদ্যমান রহিবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ –

অর্থাৎ "আর তাহাদের শেষ দু'আ এই যে, সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রভু।" শুক্‌র সম্বন্ধে গ্রন্থের শেষ ভাগে লেখা উচিত ছিল। কিন্তু সবরের সহিত ইহার সম্পর্ক থাকায় এ-স্থানেই লেখা হইল।

শুক্‌র যে শ্রেষ্ঠ গুণ, ইহার প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় যিকিরের সহিত একত্র করিয়া ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ –

অর্থাৎ "তোমরা আমার যিকির কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণে রাখিব আর তোমরা আমার শুক্‌র কর এবং আমার অকৃতজ্ঞ হইও না।" (সূরা বাকারাহ্, ১৮ রুকূ, ২ পারা) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে-ব্যক্তি আহার করিয়া আল্লাহ্‌র শুক্‌রিয়া আদায় করে, তাহার মরতবা রোযাদার এবং সবরকারীর মরতবার সমতুল্য।" তিনি আরও বলেন–"কিয়ামতের দিন, 'প্রশংসাকারিগণ দণ্ডায়মান হউক' এই বাণী বিঘোষিত হইলে যাহারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র শুক্‌র করে, কেবল তাহারাই উঠিবে।" ধন জমাইতে নিষেধ করিয়া যখন এই আয়াত নাযিল হইল–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ -

তখন হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, তবে আমরা কোন্ ধন সঞ্চয় করিব?" তিনি উত্তরে বলিলেন–"শুক্রকারীর হৃদয়, যিকিরকারীর রসনা এবং ঈমানদার পত্নী।" অর্থাৎ দুনিয়াতে এই তিন জিনিস লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাক। ঈমানদার পত্নী আল্লাহ্র যিকিরে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে পুরুষকে সাহায্য করিয়া থাকে, এই জন্যই তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত ইব্নে মাস্উদ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"শুক্র ঈমানের অর্ধেক।" হযরত আতা রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, তিনি হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হার নিকট গমনপূর্বক রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিস্ময়কর অবস্থার কিছু বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন–"হযরতের এমন কোন্ অবস্থা ছিল যাহা বিস্ময়কর নহে?" তৎপর তিনি বলিতে লাগিলেন–"এক রজনীতে রাত্রিকালের পোশাক পরিধান করত তিনি আমার নিকট আগমন করিলেন এবং আমার সহিত আমার বিছানায় শয়ন করিলেন। তাঁহার নূরানী দেহ আমার অনাবৃত শরীরের সহিত মিলিত ছিল, এমতাবস্থায় তিনি বলিলেন– হে আয়েশা, আল্লাহর ইবাদতের জন্য আমাকে যাইতে দাও। আমি আরয করিলাম–'যদিও আমি কামনা করি যে, আমি আপনার নিকটে থাকি, তথাপি বিস্মিল্লাহ আপনি গমন করুন।' হযরত (সা) উঠিয়া মশক হইতে পানি লইয়া ওযু করিলেন এবং ইহাতে অল্প পরিমাণে পানি ব্যবহার করিলেন। ইহার পর তিনি নামাযে লিপ্ত হইলেন এবং সংগে সংগে রোদন করিতেছিলেন। এইরূপে প্রভাত হইয়া গেল এবং হযরত বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁহাকে ফজরের নামাযের জন্য ডাকিতে আসিলেন। আমি হযরত (সা)-এর নিকট নিবেদন করিলাম–'হে আল্লাহ্র রাসূল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিষ্পাপ করিয়াছেন। তথাপি আপনি রোদন করেন কেন?' হযরত (সা) বলিলেন–'আমি কি শুক্র গুযার (কৃতজ্ঞ) বান্দা নহি? আমার উপর এই (নিম্নলিখিত) আয়াত নাযিল হইয়াছে। এমতাবস্থায় আমি রোদন না করিয়া থাকিতে পারি কিরূপে?" আয়াতখানা এই–

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ - اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃজনে এবং পর্যায়ক্রমে দিবস ও রজনীর গমনাগমনে বুদ্ধিমানের জন্য নিদর্শনাবলী রহিয়াছে; যাহাদের অবস্থা এই যে, তাহারা দাঁড়াইয়া, উপবেশন করিয়া এবং শয়ন করিয়াও আল্লাহ্র যিকির করে।" (সূরা আলে ইম্‌রান, ২০ রুকূ, ৪ পারা।)

যাঁহারা তদ্রূপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ইহা লাভের আনন্দে তাঁহারা রোদন করিয়া থাকেন, সে রোদন ভয়ের জন্য হয় না। যেমন বর্ণিত আছে যে, একজন পয়গম্বর একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন, ইহা হইতে অনেক পরিমাণে পানি বাহির হইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রস্তরটিকে বাকশক্তি দান করিলেন। তখন প্রস্তরটি বলিল ঃ

وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ - (অর্থাৎ মানুষ ও পাথর দোযখের ইন্ধন হইবে), যে সময় এই আয়াত নাযিল হইয়াছে, সেই হইতে ভয়ে আমি রোদন করিতেছি। পয়গম্বর (আ) পাথরটির জন্য দু'আ করিলেন–"হে আল্লাহ, এই পাথরের ভয় দূর করিয়া দাও।" এই দু'আ কবূল হইল। কিছুদিন পর এই পয়গম্বর (আ) সে প্রস্তরের নিকট দিয়া যাইবার সময়ে দেখিলেন প্রস্তরটি হইতে পূর্বের ন্যায় পানি প্রবাহিত হইতেছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–"এখন তুমি রোদন করিতেছ কেন?" প্রস্তর বলিল–"পূর্বে ভয়ে কাঁদিতেছিলাম। এখন কৃতজ্ঞতার আবেগে কাঁদিতেছি।" মানুষের হৃদয়ও এইরূপ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু মানব হৃদয় প্রস্তর অপেক্ষাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মানুষের রোদন করা উচিত। কখনও শোকে অভিভূত হইয়া, আবার তখনও-বা আনন্দের আবেগে তাহাকে রোদন করিতে হইবে। তবেই তাহাদের হৃদয় কোমল হইবে।

শুকরের হাকীকত–ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ধর্মপথে ক্রমোন্নতির তিনটি মৌলিক উপকরণ আছে; যথা ঃ–(১) জ্ঞান, (২) মানসিক অবস্থা ও (৩) কর্ম। তন্মধ্যে জ্ঞানই মূল উপকরণ। অন্তররাজ্যে জ্ঞানের উদয় হইলেই মনে

এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয়। মনের এই অবস্থাই কর্মের প্রেরণা যোগায় এবং তৎপর কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। সর্ববিধ সুখ-সম্পদ একমাত্র আল্লাহ্র নিকট হইতে পাওয়া যায়, এই জ্ঞান হইতেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে এবং সুখ-সম্পদ লাভের আনন্দ হৃদয়ে এক প্রকার অবস্থার সৃষ্টি করে। তৎপর আল্লাহ তা'আলা যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্পদ দান করিয়াছেন, তাহা ঠিক ঠিক সেই কার্যে ব্যয় করিলে কর্ম সম্পাদিত হয়। অন্তর ও রসনা, এই উভয়ের সহিত কর্মের সম্বন্ধে রহিয়াছে। এই সকল বিষয় ভালরূপে অবগত না হইলে শুকরের হাকীকত বুঝা যাইবে না।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞানের পরিচয়–তুমি যে সম্পদ পাইয়াছ, তাহা একমাত্র আল্লাহই দান করিয়াছেন এবং অন্য কেহই তাঁহার শরীক নাই, এই জ্ঞানকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞান বলে। সম্পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন মধ্যবর্তী উপকরণের উপর দৃষ্টি নিপতিত হইলে এবং সম্পদ প্রদান ব্যাপারে এই মধ্যবর্তী উপকরণের কোন অধিকার আছে বলিয়া মনে করিলে শুকর ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হইল। বাদশাহ যদি তোমাকে উপঢৌকনস্বরূপ পোশাক দান করেন এবং এই দানের মধ্যে উযীরের অনুগ্রহও কিছু অনুভব কর, তবে বাদশাহ্র প্রতি তুমি পূর্ণভাবে কৃতজ্ঞ হইতে পারিবে না, বরং এই কৃতজ্ঞতা বাদশাহ ও উযীরের মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া গেল এবং পোশাক প্রাপ্তির আনন্দ পুরাপুরিভাবে বাদশাহ্র জন্য হইল না। তুমি যদি মনে কর যে বাদশার আদেশে পোশাক পাইয়াছ, কিন্তু এই আদেশ কাগজ ও কলমের মাধ্যমে হইয়াছে, তবে কৃতজ্ঞতার কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ, তুমি বুঝিলে যে, কাগজ-কলম অপরের আজ্ঞাধীন এবং দানকার্যে উহাদের কোনই অধিকার নাই। তুমি যদি মনে কর যে, খাজাঞ্চীর মাধ্যমে উপঢৌকন পাইলে তাহাতেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোন ত্রুটি হয় না। কারণ, খাজাঞ্চীও আজ্ঞাধীন এবং তাহারও নিজস্ব ক্ষমতা নাই। সে বাদশাহ্র আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারে না এবং আদেশ ব্যতীত কিছু দিতেও পারে না। খাজাঞ্চীও কলমের ন্যায় আজ্ঞাধীন।

ঠিক তদ্রূপ যদি মনে কর যে, পৃথিবীর সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বারিধারা হইতে জন্মে এবং বারিধারা মেঘের কারণে হইয়া থাকে; আর অনুকূল বাতাসের দরুন নৌকাডুবি হইতে পরিত্রাণ পাও বলিয়া ভাব তবে ঠিক ও সংগত উপায়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইল না। কিন্তু যদি মনে কর যে, মেঘ, বৃষ্টি, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি লেখকের হস্তস্থিত কলমের ন্যায় আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন, কলম যেমন নিজে নিজে কিছুই করিতে পারে না, এই সকল বস্তুও নিজ ক্ষমতায় কিছুই করিতে পারে না, তবে কৃতজ্ঞতাতে কোন ত্রুটি হয় না। অন্যের হাত হইতে কোন দ্রব্য পাইয়া তাহাকেই দাতা বলিয়া জানা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা এবং শুকরের মরতবা হইতে দূরে পর্দার অন্তরাল হওয়ার নিদর্শন। অন্যের নিকট হইতে কোন বস্তু পাইলে বরং মনে করিবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর এক দণ্ডধারী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এই দণ্ডধারী বলপ্রয়োগে তোমাকে ইহা দিবার জন্য তাহাকে বাধ্য করিয়াছে। সে ত ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সর্ববিধ চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। তাহার ক্ষমতা থাকিলে সে কপর্দকও তোমাকে দিত না।

যাহাকে দণ্ডধারী বলা হইল ইহা ইরাদা বা ইচ্ছা। আল্লাহ তা'আলা ইহা দাতার মনে সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। এই ইচ্ছা সৃজনপূর্বক তিনি তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, দান করিলেই সে ইহকালের সৌভাগ্য লাভ করিবে। দুনিয়া বা আখিরাতের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই দাতা তোমাকে দিয়াছে। বাস্তবপক্ষে সে নিজে নিজেকেই দিয়াছে, তোমাকে কিছুই দেয় নাই। কারণ, দাতা তোমাকে যাহা দিয়াছে, ইহার বিনিময়ে সে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের উপায় করিয়া লইয়াছে। দাতার উপর দণ্ডধারী নিযুক্ত করিয়া আল্লাহই নিঃস্বার্থভাবে তোমাকে ঐ বস্তু দান করিয়াছেন।

সুতরাং যাহার হাত হইতে কিছু পাওয়া যায়, সে উল্লেখিত খাজাঞ্চীর ন্যায় এবং খাজাঞ্চী আবার আদেশ-লেখকের হস্তস্থিত কলমের ন্যায় মধ্যবর্তী কারণমাত্র। উহাদের কাহারও নিজের স্বাধীন ক্ষমতা নাই। অপরপক্ষে আল্লাহ তা'আলা দাতার হৃদয়ে ভবিষ্যত মঙ্গললাভের আশা সৃষ্টি করত তদ্দ্বারা বলপ্রয়োগে দাতাকে বাধ্য করিতেছেন, তুমি যখন ভালরূপে উহা বুঝিতে পারিবে তখন তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সমর্থ হইবে। বরং উপলব্ধিই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। যেমন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম মুনাজাতে আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ, তুমি হযরত আদম আলায়হিস সালামকে নিজ হস্তে সৃজন করিয়াছ এবং তাঁহার প্রতি অমুক অমুক অনুগ্রহ করিয়াছ। কি প্রকারে তিনি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন?" আল্লাহ বলিলেন–"আদম (আ) হৃদগতভাবে জানিয়াছিল, সমস্ত সম্পদই সে আমা হইতে পাইয়াছে এবং তাহার এই জ্ঞানই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা।"

ঈমান চিনিবার বহু পন্থা আছে। ইহার প্রথম পন্থা তাক্‌দীস অর্থাৎ সৃষ্ট পদার্থে যে-সকল গুণ আছে এবং মানুষের কল্পনা ও খেয়ালে আসে, তৎসমুদয় হইতে আল্লাহ্‌কে পাকপবিত্র বলিয়া জানা। সুব্‌হানাল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করি) বাক্য এই অর্থই প্রকাশ করে। দ্বিতীয় তাওহীদ অর্থাৎ এই বিশ্বাস করা যে, উক্ত পবিত্রতার সহিত আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন অংশী নাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য নাই) কলেমা এই অর্থই প্রকাশ করে। তৃতীয়, তাহ্‌মীদ অর্থাৎ এই জানা যে, বিশ্বজগতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই আল্লাহ্ হইতে হয় এবং সমস্তই তাহার প্রদত্ত নি'আমত। ইহাই আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র) বাক্যের অর্থ। এই তিনটির মধ্যে শেষোক্তটিই সর্বশ্রেষ্ঠ; কারণ, অপর দুইট জ্ঞান ইহারই অধীন। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"একবার 'সুব্‌হানাল্লাহ' বলিলে দশটি সওয়াব, একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলিলে বিশটি সওয়াব এবং একবার 'আলহাম্‌দুলিল্লাহ্' বলিলে ত্রিশটি সওয়াব পাওয়া যায়।" এই কলেমাসমূহ শুধু মুখে উচ্চারণ করিলেই তদ্রূপ সওয়াব হয় না, বরং এইগুলি যে নিগূঢ় তত্ত্ব বহন করে, ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করত উচ্চারণ করিলেই সেইরূপ সওয়াব হইয়া থাকে। ইল্‌মে শুক্‌র অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞানের ইহাই প্রকৃত অর্থ যাহা এ-পর্যন্ত বর্ণিত হইল।

কৃতজ্ঞ হৃদয়ের অবস্থার পরিচয়–কৃতজ্ঞতা-জ্ঞান হৃদয়ে জন্মিলে অন্তরে যে-আনন্দ হয়, তাহাকে উহার (কৃতজ্ঞতার) হাল বা অবস্থা বলে। কারণ, লোকে কাহারও নিকট হইতে কোন সম্পদ পাইলে তাহার প্রতি আনন্দিত হয়। এই আনন্দ তিনটি কারণে হইতে পারে। **প্রথম কারণ**–যে বস্তুর অভাবে লোকে অসুবিধা ভোগ করে, ইহা পাইয়া তাহার অভাব বিদূরিত হইলে সে আনন্দিত হয়। এইরূপ আনন্দকে কৃতজ্ঞতা বলা চলে না। কারণ, মনে কর, বাদশাহ্ সফরের আয়োজন করত তাঁহার ভৃত্যকে একটি অশ্ব দান করিলেন। এমতাবস্থায় ভৃত্য যদি এই কারণে আনন্দিত হয় যে, তাহার একটি অশ্বের অভাব ছিল এবং ইহা এখন মোচন হইল, তবে এইরূপ আনন্দকে বাদ্‌শাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা বলিয়া গণ্য হইবে না। কেননা, কোন মরুপ্রান্তরে অশ্ব পাইলেও ভৃত্যের তদ্রূপ আনন্দ হইত। **দ্বিতীয় কারণ**– অধিক পাওয়ার আশা; যেমন বাদশাহ্ ভৃত্যকে অশ্ব দান করিলেন। ইহাতে তাহার প্রতি বাদশাহ্‌র অনুগ্রহদৃষ্টি আছে ভাবিয়া সে আরও অধিক লাভের আশায় আনন্দিত হইল। এমতাবস্থায় কোন বিজন প্রান্তরে অশ্ব পাইলে তাহার এইরূপ আনন্দ হইত না। কেননা, এ-স্থলে দাতার কারণে এবং তাহার নিকট হইতে অধিক পাওয়ার লোভে ভৃত্যের আনন্দ হইয়াছে, দাতার জন্য আনন্দ হয় নাই। এইরূপ আনন্দকে মোটামুটিভাবে ত কৃতজ্ঞতার মধ্যে গণ্য করা যায়, কিন্তু ইহা ত্রুটিপূর্ণ অসম্পূর্ণ। **তৃতীয় কারণ**–কেবল দাতার উদ্দেশ্যে। ভৃত্য যদি অশ্ব পাইয়া এই ভাবিয়া আনন্দিত হয় যে, এই সুযোগে সে বাদ্‌শাহ্‌র সঙ্গে গমন করিবে এবং বাদ্‌শাহ্‌র দর্শন লাভে চরিতার্থ হইবে এবং ইহা ব্যতীত তাহার আর কোন উদ্দেশ্যই না থাকে, তবে এই আনন্দ একমাত্র বাদ্‌শাহ্‌র জন্যই হইবে। এই প্রকার আনন্দকেই পূর্ণ কৃতজ্ঞতা বলে।

তদ্রূপ যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন বস্তু পাইয়া আনন্দিত হয়, আল্লাহ্‌কে পাইবার সুযোগ হইল ভাবিয়া আনন্দিত হয় না, এমন আনন্দকে কৃতজ্ঞতা বলে না। অপরপক্ষে যে-দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, ইহাকে যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও করুণার নিদর্শন মনে করিয়া আরও অধিক পাওয়ার লোভে আনন্দিত হয়, তবে এই আনন্দকে কৃতজ্ঞতা বলা হইবে বটে, কিন্তু ইহা ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ। আবার আল্লাহ্‌র দানকে ধর্মকার্যের সুযোগ-সুবিধা মনে করত আনন্দিত হইয়া ইলম ও ইবাদতে লিপ্ত হইলে এবং প্রকৃত দাতা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করিলে তবে ইহাকে পূর্ণ কৃতজ্ঞতা বলে।

প্রকৃত শুক্‌রের নিদর্শন–প্রকৃত ও পূর্ণ শুক্‌রের নির্দশন এই— দুনিয়ার যে সকল বস্তু ইবাদতকার্যে বিঘ্ন ঘটায় তৎপ্রতি মন বিরক্ত হইয়া উঠা এবং এই সমস্ত জিনিসকে সম্পদ বলিয়াই মনে না করা; বরং তদ্রূপ বস্তু হইতে বঞ্চিত হওয়াকে সম্পদ মনে করিয়া তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সুতরাং যে বস্তু ধর্মপথে সাহয়ক ও সাহায্যকারী না হয় ইহা পাইয়া আনন্দিত হওয়া উচিত নহে। এইজন্যই হযরত শিব্‌লী (র) বলেন– "প্রাপ্ত বস্তুর দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত না করিয়া একমাত্র দাতার দিকে দৃষ্টিপাত করাকেই শুক্‌র বলে।" যে-ব্যক্তি চক্ষু, উদর, কাম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তু ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে আনন্দ পায় না, তাহার পক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে।

অতএব, উপরে সম্পদ লাভে আনন্দিত হওয়ার যে-তিনটি কারণ বর্ণিত হইল, অন্ততপক্ষে ইহার দ্বিতীয় কারণ অবলম্বনে তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে; কেননা, প্রথম কারণ অবলম্বনে আনন্দিত হওয়াকে কৃতজ্ঞতাই বলে না।

কৃতজ্ঞতা-প্রকাশক আমলের পরিচয় –অন্তর, রসনা এবং দেহ দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশক আমল হইয়া থাকে। সকলের মঙ্গল কামনা করিলে এবং অন্যের সম্পদ দর্শনে ঈর্ষা না করিলে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। সকল অবস্থায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ বলা ও আল্লাহ্‌র জন্য আনন্দ প্রকাশ করা রসনার কৃতজ্ঞতা। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"তুমি কেমন আছ?" ঐ ব্যক্তি উত্তর দিলেন–"আলহাম্‌দুলিল্লাহ্‌, ভাল আছি।" হযরত (সা) বলিলেন–"আমি এই উত্তরই চাহিয়াছিলাম।" আল্লাহ্‌র প্রশংসাসূচক বাক্যে উত্তর পাইবার উদ্দেশ্যেই পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ একে অন্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন, যেন উত্তরদাতা ও শ্রবণকারী উভয়েই সওয়াব পাইতে পারেন।

কুশল জিজ্ঞাসা করাতে বিপদাপদে নিপতিত বলিয়া অভিযোগ করিরে পাপী হইতে হয়। একজন অসহায় দুর্বল মানবের পক্ষে অপর একজন নিতান্ত নিঃসহায় অক্ষম ব্যক্তির নিকট পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তা'আলার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা অপেক্ষা বড় অন্যায় আর কি হইতে পারে? বিপদাপদে পতিত হইয়াও আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেওয়া আবশ্যক। কেননা উহাই হয়ত সৌভাগ্যের কারণ হইতে পারে। যদি ধন্যবাদ দিতে না পার তবে অন্ততপক্ষে বিপদে সবর করা উচিত।

শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্‌র নি'আমত মনে করিয়া যে-কাজের জন্য যে-অঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাকে সেই কাজে নিযুক্ত করিয়া রাখিলে দেহ দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আখিরাতের কাজের জন্য সৃজন করিয়াছেন এবং তোমাকে আখিরাতের কাজে লিপ্ত দেখিতেই তিনি পসন্দ করেন। তুমি যদি শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় কাজে নিযুক্ত রাখ, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হইল; কিন্তু তাঁহার প্রিয় কার্য বলিতে ইহা বুঝিও না যে, তদ্রূপ কার্যে তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ বা লাভ আছে। বরং ইহাই মনে রাখিবে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয় কার্য করিলে তোমার নিজেরই মঙ্গল হইবে। বান্দার মঙ্গল সাধনই তাঁহার প্রিয় কাজ। ইহার উদাহরণ এই যে, মনে কর, কোন এক গোলামের দুরবস্থা দেখিয়া তাহার উপর বাদশাহ্‌র কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল। গোলাম বাদশাহ হইতে বহু দূরে। কিন্তু বাদশাহ একটি অশ্ব ও কিছু পাথেয় তাহার নিকট প্রেরণা করিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, গোলাম অশ্বে আরোহণ করত পাথেয় সামগ্রী ভোগে বাদশাহ্‌র দরবারে আগমনপূর্বক

তাঁহার নৈকট্যপ্রাপ্ত অনুচররূপে গণ্য হইয়া বাদশাহ্‌র অশেষ অনুগ্রহ ও অসীম সম্মানের অধিকারী হইবে। সে-গোলাম দূরে থাকিলে বা দরবারে আসিলে বাহশাহ্‌র কোন লাভ-লোকসান নাই। কারণ, সে আসিলে বাদশাহ্‌র রাজ্য বৃদ্ধি পাইবে না এবং না আসিলেও কোন দেশ অধিকারচ্যুত হইয়া যাইবে না। দরবারে আসিলে গোলামেরই মঙ্গল হইবে বলিয়া তিনি তাহার আগমন কামনা করেন। কারণ, বাদশাহ দাতা ও দয়ালু হইলে সকলের মঙ্গল সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য থাকে এবং নিঃস্বার্থভাবে কেবল তাহাদের জন্যই এই মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, ইহাতে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির কোন মতলব তাঁহার থাকে না। সেই গোলাম যদি অশ্বারোহণে বাদশাহ্‌র দরবারের দিকে রওনা করে এবং পাথেয় ব্যবহার করিতে থাকে তবে সে অশ্ব ও পাথেয় উভয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। গোলাম যদি অশ্বারোহণে বাদশাহ্‌র দরবারের বিপরীত দিকে গমন করিতে থাকে এবং দরবার হইতে আরো দূরে সরিয়া পড়ে, তবে সে অকৃতজ্ঞ হইল। আবার যদি সে দরবার হইতে আর দূরেও যায় না এবং নিকটবর্তীও হয় না, পূর্বস্থানেই বসিয়া বসিয়া অশ্ব এবং পাথেয় প্রদানের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দেয় তবে ইহাও অকৃতজ্ঞতার মধ্যেই পরিগণিত। কিন্তু ইহা পূর্বোক্ত অকৃতজ্ঞতার ন্যায় তত জঘন্য নহে।

তদ্রূপ আল্লাহ্‌র দানসমূহ তাঁহার নৈকট্য লাভের চেষ্টায় ইবাদত-কার্যে ব্যয় করিলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ইহা না করিয়া এইগুলি পাপ কার্যে অপচয় করত আল্লাহ্‌ হইতে অধিকতর দূরে সরিয়া পড়িলে তবে ঘোর অকৃতজ্ঞতা করা হয়। আবার নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে ঐ দানগুলি ব্যয় করত ইহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিলেও অকৃতজ্ঞতা করা হয়। কিন্তু পাপকার্যে ব্যয়ের ন্যায় ইহা তত জঘন্য হইবে না।

আল্লাহ্‌র প্রিয় ও অপ্রিয় কার্য চিনিবার আবশ্যকতা— যখন বুঝা গেল যে, আল্লাহ্‌-প্রদত্ত প্রতিটি সম্পদ তাঁহার প্রিয় কার্যে ব্যয় করিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, তখন আল্লাহ্‌র অপ্রিয় কার্য হইতে প্রিয় কার্যসমূহ পৃথক করিয়া লইতে না পারিলে কেহই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে পারে না। আবার এই জ্ঞানও নিতান্ত সূক্ষ্ম। কোন্‌ উদ্দেশ্যে কোন্‌ জিনিস সৃজন করা হইয়াছে, তাহা না জানিলে কোন্‌ কার্য আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং কোন্‌টি অপ্রিয় নির্ণয় করা যায় না। এ-স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইবে। বিস্তৃত বিবরণ 'ইয়াহ্‌ইয়াউল উলূম' গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সেই সমুদয়ের সংকুলন হইবে না।

সম্পদের অকৃতজ্ঞতা

আল্লাহ্ তা'আলা যে-উদ্দেশ্যে যে-বস্তু সৃজন করিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইলে এবং তিনি যে-কার্য সম্পাদনের জন্য যে পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই কার্যে উহা প্রয়োগ না করিয়া অন্য উদ্দেশ্যে উহার অপব্যবহার করিলে সম্পদের অকৃতজ্ঞতা করা হয়। আল্লাহ্-প্রদত্ত বস্তু তাঁহারই প্রিয় কার্যে ব্যয় করিলে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়, আর অপ্রিয় কার্যে ব্যয় কিরলে অকৃতজ্ঞতা হয়। কোন্ কাজটি আল্লাহ্র প্রিয় এবং কোনটি অপ্রিয়, একমাত্র শরীয়তই তাহা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে। অতএব আল্লাহ্-প্রদত্ত সম্পদ তাঁহার নির্দেশানুসারে তাঁহারই ইবাদতে ব্যয় করা আবশ্যক।

যাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাঁহাদের সম্মুখে এক প্রশস্ত পথ রহিয়াছে। সেই পথে তাঁহারা পর্যবেক্ষণ, যুক্তি-প্রমাণ এবং ইলহাম (আল্লাহ্র তরফ হইতে হৃদয়ে উদ্ভূত ইঙ্গিত) দ্বারা প্রত্যেক কার্যের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারেন। সাধারণ লোক হয়ত বুঝিবে, আল্লাহ্ তা'আলা মেঘকে বারিবর্ষণের উদ্দেশ্যে সৃজন করিয়াছেন। আবার বৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্য হইল ঘাস উৎপন্ন করা এবং ঘাস সৃষ্টির উদ্দেশ্য জীবজন্তুর আহারের সংস্থান করা। সে মনে করিতে পারে যে, দিবা রাত্রির পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য সূর্যের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে রাত্রি বিশ্রাম ও আরামের জন্য এবং দিবাভাগ জীবিকা অর্জন ও পার্থিব অন্যান্য কাজের জন্য নির্ধারিত হইতে পারে। সৃষ্টির এবংবিধ প্রকাশ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকলেই অবগত আছে। ইহা ছাড়া সূর্যের সৃষ্টির মধ্যে এমন রহস্য রহিয়াছে যাহার সন্ধান সকল লোকে জানে না। গগনমণ্ডলে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র বিরাজ করিতেছে যাহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সাধারণ লোক অবগত নহে। যেমন সকলেই জানে যে, হস্ত ধারণের নিমিত্ত, পদ গমনের জন্য এবং চক্ষু দেখিবার জন্য, কিন্তু হৃৎপিণ্ড এবং প্লীহা কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হইয়াছে এবং চক্ষুগোলকের উপর কি কারণে দশটি পর্দা রাখা হইয়াছে, ইহা হয়ত সকলে জানে না।

যাহাই হউক, সৃষ্টি-রহস্যের কতকগুলি সূক্ষ্ম, আবার কতকগুলি নিতান্ত সূক্ষ্ম। অসাধারণ ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর কেহই এই সমস্ত বুঝিতে পারে না। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা অত্যন্ত বিস্তৃত। তথাপি সংক্ষেপে এতটুকু জানিয়া রাখা একান্ত আবশ্যক যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে আখিরাতের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন–দুনিয়ার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। পার্থিব পদার্থের মধ্যে যাহা মানুষের আবশ্যক, তাহা আখিরাতের পথে কাজে লাগিবে বলিয়াই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা কখনও মনে করা উচিত নহে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল জিনিসই মানবের জন্য সৃজন করিয়াছেন। এইরূপ বিবেচনা করিলে যে বস্তুতে তোমার কোন উপকার দেখিতে পাইবে না, ইহার সম্বন্ধে হয়ত বলিয়া ফেলিবে–"আল্লাহ্ ইহা কেন সৃষ্টি করিয়াছেন?" যেমন বলিতে পার–"আল্লাহ্ তা'আলা মশা-পিপীলিকাকে কেন সৃষ্ট করিয়াছেন? কি উদ্দেশ্যেই-বা তিনি সাপ বানাইলেন?" তদ্রূপ পিপীলিকাও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে–"আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ কেন সৃষ্টি করিলেন? মানুষ বিনা কারণে আমাদিগকে পদদলিত করিয়া হত্যা করে।" মানুষ যেরূপ বিস্ময় প্রকাশ করে, পিপীলিকাও তদ্রূপ বিস্ময় প্রকাশ করে।

যাহাই হউক, আল্লাহ্ তা'আলা যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই স্বীয় বদান্যতায় সর্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃজনকালে প্রত্যেক পদার্থ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, খনিজদ্রব্য প্রভৃতিকে নিতান্ত সুন্দর আকার দান করিযাছেন এবং প্রত্যেকের উপযোগী সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা দান করিয়াছেন। কেননা তাঁহার কার্যে কেহই বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না এবং তাঁহার মহান দরবারে কৃপণতারও স্থান নাই। সৃষ্টির মধ্যে কোন কোন পদার্থে পূর্ণতা, শোভা ও সৌন্দর্য যে সম্যকরূপে বিকশিত হয় না, ইহা কারণ এই যে, তদ্রূপ পূর্ণ বিকাশের উপযুক্ত উহারা ছিল না, উহাদের মধ্যে ঐ গুণসমূহের পরিপন্থী গুণাবলী বিদ্যমান ছিল। সম্ভবত উক্ত বিপরীত গুণাবলী অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উহাদের মধ্যে নিহিত ছিল। কারণ অগ্নি কখনও পানির শীতলতা ও আর্দ্রতা গ্রহণ করিতে পারে না; কেননা কোন উষ্ণ দ্রব্যই শীতলতা গ্রহণ করে না। ইহার কারণ এই যে, শীতলতা উষ্ণতার বিপরীত। পক্ষান্তরে উষ্ণ দ্রব্যের উষ্ণতাও ইহা সৃষ্টির উদ্দেশ্য। ইহার উষ্ণতা নষ্ট করিয়া দেওয়াও ক্ষতি।

বাস্তবপক্ষে যে আর্দ্রতা হইতে আল্লাহ্ মাছি সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্বারা মাছি সৃজন করিবার কারণ এই যে, এই আর্দ্রতার পূর্ণ বিকাশই হইল মাছি (অর্থাৎ ইহা চরম বিকাশপ্রাপ্ত হইলে মাছি হওয়ারই উপযোগী, অন্য কিছু হওয়ার উপযোগী নহে) এবং যে আর্দ্রতা এইরূপ পূর্ণতা লাভের উপযুক্ত, তিনি ইহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখেন নাই। কেননা বঞ্চিত রাখিলেও কৃপণতা হইত। মাছির জীবন ও শক্তি, অনুভূতি ও গতি এবং চমৎকার আকৃতি ও বিস্ময়কর

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। এইজন্যই সেই আর্দ্রতার আদিম অবস্থায় এইগুলির কিছুই ছিল না। এইজন্যই সেই আর্দ্রতার তুলনায় মাছি চরম বিকশিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত। যে আর্দ্রতার চরম পরিণতি মাছি, ইহা হইতে মানুষ সৃষ্টি না করিবার কারণ এই যে মানব সৃষ্টির জন্য আবশ্যক গুণাবলী ধারণ করিবার শক্তি ও যোগ্যতা সে আর্দ্রতার ছিল না। কারণ, মক্ষিকা-প্রসূ আর্দ্রতার মধ্যে যে সকল গুণ আছে, উহা মানুষের প্রয়োজনীয় গুণের বিপরীত। (সুতরাং মানবের উপযোগী গুণাবলী মক্ষিকা-প্রসূ আর্দ্রতার মধ্যে বিকাশ পাইতে পারে না।) অথচ মক্ষিকার জন্য যে পদার্থের প্রয়োজন ছিল, তাহা হইতে ইহা বঞ্চিত রহে নাই।

মক্ষিকার জন্য পাখা, চুল, হস্ত, পদ, চক্ষু, মুখ, মস্তক, উদর, অন্নস্থলী, পাকস্থলী, অন্নের অসার ভাগ বাহির হইবার স্থান প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আবশ্যক। উহা ছাড়া ক্ষুদ্রত্ব, পরিচ্ছন্নতা এবং লঘুত্ব ইহার দেহের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'আলা মাছিকে এই সকলই দান করিয়াছেন। মাছির জন্য দর্শনশক্তি আবশ্যক। কিন্তু ইহার মস্তক নিতান্ত ক্ষুদ্র হওয়াতে চক্ষের ধূলিবালি পরিষ্কার করিয়া ইহা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ রাখিবার জন্য পলকের আবশ্যক। অথচ মক্ষিকার পলক নাই। সুতরাং ইহার পরিবর্তে মক্ষিকাকে চক্ষু পরিষ্কার করিবার জন্য দুইটি অতিরিক্ত হস্ত দান করা হইয়াছে। ধূলি পড়িবামাত্র মক্ষিকা সেই হস্ত দ্বারা চক্ষু মুছিয়া ফেলে এবং তৎপর হস্ত দুইটি পরস্পর ঘর্ষণ করত হস্ত সংলগ্ন ধূলিবালি দূরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়।

আল্লাহ্ তা'আলার করুণা যে সৃষ্টির সকলের উপর রহিয়াছে, কেবল মানুষের উপর সীমাবদ্ধ নহে, ইহা বুঝাইবার জন্যই এতগুলি কথা বলা হইল। পোকামাকড়, কীটপতঙ্গেরও যাহা কিছু আবশ্যক তৎসমুদয় ইহাদের প্রত্যেককেই তিনি পূর্ণমাত্রায় দান করিয়াছেন। এমন কি হস্তীর যে-আকৃতি পোকামাকড়কেও তিনি সেই আকৃতিতে সৃজন করিয়াছেন। কোন পোকামাকড়ই মানবের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। বরং তোমরা যেমন তোমাদের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছ, তদ্রূপ প্রত্যেক প্রাণীই তাহার নিজের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। কারণ, সৃষ্টির প্রারম্ভে তোমার এমন কোন সম্পর্ক বা যোগ্যতা ছিল না যাহার দরুন তুমি সৃষ্ট হওয়ার দাবি করিতে পারিতে। অপর কোন বস্তু বা প্রাণীরও তদ্রূপ কোন দাবি ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলার করুণা-সাগর অতল অসীম। এই সমুদ্রে তুমিও ডুবিয়া রহিয়াছ এবং পিপীলিকা, মক্ষিকা, হস্তী, মোরগ ইত্যাদি সকলেই ডুবিয়া আছে। তন্মধ্যে অপূর্ণটিকে পূর্ণটির জন্য উৎসর্গ করা হইয়াছে। বিশ্বে সকল সৃষ্টির মধ্যে

মানুষ সর্বাধিক পূর্ণ। সুতরাং ইচ্ছায় হউক কি অনিচ্ছায় হউক, অধিকাংশ বস্তু মানুষের জন্য উৎসৃষ্ট রহিয়াছে। ভূগর্ভের অভ্যন্তরে এবং সমুদ্রের অতল তলে এমন অনেক পদার্থ আছে যাহা একেবারে মানুষের অধিকারের বাহিরে। কিন্তু তৎসমুদয়ের বাহ্য আকৃতি এবং আভ্যন্তরিক গঠনের মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলার তদ্রূপ করুণাই পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের নির্মাণে আল্লাহ্ তা'আলা যে কি অপরিসীম শিল্প-নৈপুণ্য ও কারুকার্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে মানব শক্তি একেবারে শ্রান্ত এবং অক্ষম হইয়া পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান সমুদ্রে সন্তরণ করিতে যাইয়া জ্ঞানিগণ ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ-সকলের বর্ণনা অত্যন্ত বিস্তৃত।

উল্লিখিত কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য এই—তোমরা নিজদিগকে জগতে এইরূপ সর্বপ্রধান বলিয়া ভাবিও না যাহাতে অন্যান্য সকলই তোমাদের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে থাক এবং যে-জিনিসে তোমাদের কোন উপকার নাই, ইহা সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ কর—"আল্লাহ্ কেন সৃজন করিলেন? ইহার সৃষ্টির পশ্চাতে ত কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নাই।" যখন তুমি অবগত হইয়াছ যে, পিপীলিকা তোমার জন্য সৃষ্ট নহে, তখন ইহাও জানিয়া রাখ যে, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ ইত্যাদি কিছুই তোমার জন্য সৃষ্ট নহে। যদিও ঐরূপ বহু বস্তু হইতে তুমি উপকার পাইয়া থাক, তথাপি তৎসমুদয় তোমার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। যেমন মক্ষিকা হইতে তোমরা উপকার পাইয়া থাক, তথাপি ইহা তোমাদের জন্য সৃষ্ট নহে। মক্ষিকাকে পচাগলিত দুর্গন্ধময় পদার্থ খাইয়া ফেলিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে যেন দুর্গন্ধ হ্রাস পায়। তদ্রূপ মক্ষিকা কসাই হইতে উপকার পাইয়া থাকে; তবুও কসাইকে মক্ষিকার জন্য সৃজন করা হয় নাই। তোমরা মনে কর, তোমাদের জন্য সূর্য প্রত্যহ উদিত হয়। মাছি কসাইর দোকান হইতে রক্ত ও আবর্জনাদি যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পাইবে, এইজন্য কসাই দোকান খুলে, এই ধারণা এবং তোমাদের জন্য সূর্য প্রত্যহ আকাশে উঠে এই বিবেচনা উভয়টিই সমান ভ্রান্তিমূলক। যদিও কসাইর দোকানের অনাবশ্যক বস্তু মাছির জীবিকা এবং ইহার জীবন ধারণের উপায়, তথাপি কসাই তাহার নিজ কাজে লিপ্ত থাকে এবং মাছি কি করিতেছে, সেইদিকে মোটেই খেয়াল করে না। (কারণ, মাছির জন্য সে দোকান খুলে নাই; তাহার দোকান খোলার অন্য উদ্দেশ্য আছে।) তদ্রূপ সূর্য আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালনার্থ গগনমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে। সে ভ্রমেও তোমাদের কথা মনে করে না। অবশ্য ইহা ঠিক

যে, সূর্যের আলোকে তোমাদের নয়নে দৃষ্টিক্ষমতা জন্মে এবং ইহারই উত্তাপে অতিরিক্ত অংশে মৃত্তিকা নাতিশীতোষ্ণ হইয়া থাকে; আর মৃত্তিকার এই নাতিশীতোষ্ণতার দরুনই বীজ হইতে অঙ্কুর, বৃক্ষ, পুষ্প ও ফল উৎপন্ন হয় যাহা হইতে তোমরা আহার্য পাইয়া থাক।

উপরিউক্ত কথাগুলি যদি ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পার তবেই যে-সকল বস্তুর সহিত তোমাদের কোন সংস্রব নাই, শূক্রের অর্থ বর্ণনাকালে তৎসমুদয়ের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের উল্লিখিত আলোচনা সার্থক হইবে।

যে-সকল বস্তুর সহিত মানবের সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, সমস্তের কথা বলাই অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম–চক্ষু। চক্ষু দুটি কাজের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে–(১) ইহার সাহায্যে তুমি স্বীয় অভাব মোচনের পথ অবগত হইতে পার; (২) চক্ষুর সাহায্যে আল্লাহ তা'আলার আশ্চর্য শিল্পনৈপূণ্য ও বিচিত্র কারুকার্য পর্যবেক্ষণপূর্বক তাঁহার পরিচয় ও শ্রেষ্ঠত্ব অবগত হইতে পার। চক্ষু দ্বারা কোন গায়র-মুহার্‌রামের (যাহার সহিত জীবনে কখনও বিবাহ দুরস্ত এমন নারীর) প্রতি দর্শন করিলে, চক্ষু যে আল্লাহ্-প্রদত্ত একটি নি'আমত, ইহার অকৃতজ্ঞতা করা হইবে। আবার ভাবিয়া দেখ, সূর্যের আলোক ব্যতীত তুমি দেখিতে পাও না এবং আকাশ-পৃথিবীও সূর্য ব্যতীত সম্ভবপর নহে। কেননা, সূর্য আছে বলিয়াই দিবারাত্র সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব, গায়র-মুহার্‌রামের প্রতি দর্শন করিলে শুধু যে চক্ষু ও সূর্যরূপ সম্পদেরই অকৃতজ্ঞতা হইল তাহাই নাহে, বরং তৎসঙ্গে ভূমণ্ডল এবং গগনমণ্ডল সমস্ত সম্পদেরই অকৃতজ্ঞতা করা হইল। একজনই হাদীস শরীফে উক্ত আছে–"যে ব্যক্তি পাপ করে, আকাশ-পৃথিবী তাহার লা'নত করে" দ্বিতীয়–হস্ত। হস্তের সাহায্যে তুমি নিজের কাজ করিবে, আহার করিবে, অপবিত্রতা দূর করিবে ইত্যাদি কার্যের জন্য আল্লাহ তা'আলা হস্ত দান করিয়াছেন। হস্ত দ্বারা পাপ করিলে হস্তরূপ সম্পদের অকৃতজ্ঞতা হইবে। এমনকি ডান হাত দ্বারা যদি এস্তেঞ্জা কর এবং বাম হাত দ্বারা কুরআন শরীফ ধর তবুও নি'আমতের নাশুক্‌রী হইবে। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায়বিচার পছন্দ করেন এবং উত্তমের জন্য উত্তম ও অধমের জন্য অধম ব্যবহার করিলে ন্যায়বিচার করা হয়। কিন্তু ডান হস্তে এস্তেঞ্জা ও বাম হস্তে কুরআন শরীফ ধরিলে তুমি আল্লাহ তা'আলার যাহা প্রিয়, তাহার বিপরীত কাজ করিলে। দুই হস্তের মধ্যে অধিকাংশ লোকের একটি হস্তকে অধিক বলবান

করিয়া সৃজন করা হইয়াছে এবং ইহাই (অর্থাৎ ডান হস্ত) উত্তম। আবার মানবের কাজও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত– কতকগুলি উত্তম, আর কতকগুলি অধম। যে সকল কাজ উত্তম তাহা ডান হাতে এবং অধমগুলি বাম হাতে করা উচিত। তাহা হইলেই সুবিচার করা হইবে। অন্যথায় পশুদের ন্যায় অজ্ঞানতা ও অবিচারের কাজ হইবে। কেবলার দিকে থুথু ফেলিলে কেবলা ও অপর সকল দিকের অকৃতজ্ঞতা হয়। কারণ, মর্যাদায় সকর দিক সমান নহে। তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি দিককে গৌরববান্বিত করিয়াছেন, যাহাতে ইবাদতকালে সেই দিকে মুখ করিলে তোমরা শান্তি ও আরাম লাভ কর এবং সেই গৌরবান্বিত দিকে যে-গৃহ নির্মাণ করা হইয়াছে ইহাকে স্বীয় নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ কা'বা শরীফ। ইহাকে বায়তুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র গৃহ বলে।)

পক্ষান্তরে তোমাদের জন্য অধম কাজও আছে, যেমন পায়খানায় যাওয়া, থুথু ফেলা ইত্যাদি এবং উত্তম কাজও আছে, যথা, ওযু করা, নামায পড়া প্রভৃতি। এই উভয় প্রকারের কাজ সমান ভাবিয়া করিলে পশুতুল্য জীবন যাপন করা হইবে এবং বুদ্ধিরূপ অমূল্য সম্পদ যাহা হইতে সুবিচার ও কর্ম-কৌশল পাওয়া যায় তাহার এবং কেবলার হক নষ্ট করা হইবে। এইরূপে বিনা কারণে বৃক্ষের শাখা বা কলি ছিন্ন করিলে, হস্ত এবং বৃক্ষ উভয়েরই অপব্যবহার হইবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা শাখা-প্রশাখা, শিরা-উপশিরা বৃক্ষদেহের পোষণোপ-যোগী আহার্য গ্রহণের জন্য সৃজন করিয়াছেন এবং বৃক্ষের আহার্য-গ্রহণের ক্ষমতা ও অপরাপর শক্তি এইজন্য পয়দা করা হইয়াছে যে, ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হইবে। তুমি ডাকাতি করিয়া বৃক্ষের শাখা-পল্লব ছিন্ন করিয়া ফেলিলে অকৃতজ্ঞতা হইল। কিন্তু তোমার পূর্ণতার জন্য ইহার প্রয়োজন হইলে বৃক্ষের পূর্ণতাকে তোমার পূর্ণতার উদ্দেশ্যে বিসর্জন দিতে হইবে। কারণ, অপূর্ণের পক্ষে পূর্ণের জন্য সমর্পিত হওয়াও ন্যায়বিচার। তোমার আবশ্যক হইলেও যদি অপর ব্যক্তির অধিকারভুক্ত বৃক্ষ হইতে শাখা-পল্লব ছিড়িয়া লও তথাপি অকৃতজ্ঞতা হইবে। কেননা বৃক্ষ যাহার অধিকারে আছে সর্বাগ্রে তাহার অভাব মোচন হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

বাস্তবপক্ষে কোন জিনিসই মানুষের অধিকারে নহে। সমস্ত দুনিয়া একটি বিছানো দস্তরখানাস্বরূপ এবং দুনিয়ার সম্পদসমূহ ইহার উপর স্থাপিত আহার্য সামগ্রীতুল্য। আল্লাহ্‌র বন্দা মানবগণ যেন এই দস্তরখানে তাঁহারই

মেহমানস্বরূপ খাইতে বসিয়াছে; তাহাদের কেহই দস্তরখানে স্থাপিত কোন বস্তুর মালিক নহে। কিন্তু প্রতিটি লুকমা সকল মেহমানের জন্য যথেষ্ট নহে; সুতরাং যে-ব্যক্তি যে-লুকমা হাতে তুলিয়া লইয়াছে বা মুখ দিয়াছে, তাহা কাড়িয়া লওয়ার অধিকার অপর কাহারও নাই। মানুষ কেবল এতটুকু দ্রব্যেরই অধিকারী। যেখানে অন্য মেহ্মানের হাত পৌঁছিতে না পারে, এমন স্থানে খাদ্যদ্রব্য সরাইয়া রাখিয়া দেওয়ার অধিকার যেমন কোন মেহমানের নাই, তদ্রূপ অপর অভাবগ্রস্তকে বঞ্চিত করিয়া আবশ্যকের অধিক ধন সঞ্চিত করা এবং ধনাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখার অধিকার কাহারও নাই কিন্তু প্রকাশ্য ফত্ওয়া মতে এইরূপ কোন আদেশ নাই। কারণ, কি পরিমাণ ধনে একজনের অভাব মোচন হইতে পারে, তাহা জানা যায় না। অভাব মোচনের পর উদ্বৃত্ত ধনে কাহারও অধিকার নাই, এই রহস্য উদঘাটন করিয়া দিলে একে অপরের ধন কাড়িয়া লইবে এবং বলিবে—"অমুকের এই ধনের আবশ্যকতা নাই।" প্রয়োজনের অনুরোধে তদ্রূপ বিধান পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হেকমতের বিপরীত; কেননা ধন জমাইয়া আটকাইয়া রাখা নিষেধ।

ধনসম্পদের মধ্যে বিশেষভাবে খাদ্যশস্যাদি গোলাজাত করিয়া রাখা নিষিদ্ধ। কারণ ইহাই মানুষের জীবনধারণের উপায়। উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে যে-ব্যক্তি খাদ্যশস্য গোলাজাত করিয়া রাখে, সে আল্লাহ্‌র লা'নতে নিপতিত হইবে। যে-ব্যবসায়ী খাদ্যশস্য ধার দিয়া তদ্বিনিময়ে সুদরূপে দুইগুণ, দেড়গুণ বা আসলের অতিরিক্ত শস্য আদায় করে, সেইব্যক্তিও আল্লাহ্‌র অভিশাপগ্রস্ত। কেননা খাদ্যশস্য মানবের আহার্যবস্তু। অতএব খাদ্যশস্যের ব্যবসা করিতে যাইয়া ইহা গোলাজাত করিয়া ফেলিলে অভাবগ্রস্ত লোকদের নিকট ইহা শীঘ্র পৌঁছিতে পারে না।

স্বর্ণ-রৌপ্য আবদ্ধ রাখাও হারাম। কারণ, দুইটি উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা স্বর্ণ-রৌপ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। **প্রথম উদ্দেশ্য**-ধনের মূল্য নির্ণয়। কয়জন গোলামের বিনিময়ে একটি অশ্ব পাওয়া যায় বা একজন গোলামের পরিবর্তে কতগুলি বস্ত্র খরিদ করা চলে, ইহা প্রথমে কেহই স্থির করিতে পারে না। এবংবিধ দ্রব্যাদির পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় সংসার; নিত্য প্রয়োজনীয়। অতএব যাহার সাহায্যে সমস্ত জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করা যায়, এমন একটি দ্রব্যের আবশ্যক হইয়া পড়ে। আল্লাহ তা'আলা এই মূল্য-নির্ণয় কার্য নির্বাহের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্যকে বিচারকরূপে সৃষ্টি-করিয়াছেন। যে-ব্যক্তি এই স্বর্ণ-রৌপ্যকে

জমাইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখে, সে যেন মুসলমানদের বিচারককে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। আর যে-ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্যের পানপাত্র প্রস্তুত করে, সে যেন মুসলমানের বিচারককে বেহারা ও জোলার কাজ করিতে আদেশ দিল। কারণ, পানি হেফাযতে রাখিবার জন্যই পানিপাত্রের আবশ্যক এবং মাটি ও তামা দ্বারাও এই কাজ চলিতে পারে। **দ্বিতীয় উদ্দেশ্য**—স্বর্ণ-রৌপ্য মূল্যবান দুর্লভ বস্তু। ইহাদের বিনিময়ে যে-কোন পদার্থ পাওয়া যায় এবং সকলেই উহা পাইতে ভালবাসে। কারণ, যাহার নিকট স্বর্ণ-রৌপ্য থাকে, সে সব কিছু করিতে পারে। কাহারও নিকট হয়ত বস্ত্র আছে, কিন্তু তাহার খাদ্যের আবশ্যক অথবা তাহার নিকট খাদ্যদ্রব্য আছে, কিন্তু তাহার হয়ত বস্ত্রের আবশ্যক অথবা যাহার নিকট খাদ্যদ্রব্য আছে, তাহার হয়ত বস্ত্রের প্রয়োজনই নাই বা বস্ত্রের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবে না। ক্রয়-বিক্রয়ে এই সকর অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা স্বর্ণ-রৌপ্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে সকলের জন্য লোভনীয় করিয়াছেন। এই কৌশলেই দুনিয়াতে ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে।

বস্তুত স্বর্ণ-রৌপ্য স্বয়ং কোন অভাব মোচনের যোগ্য নহে। (কেননা খাদ্যরূপে উহা ভক্ষণ করা যায় না, বস্ত্ররূপে পরিধান করা চলে না।) মোটের উপর কথা এই যে, উহার বিনিময়ে অভাব মোচনের জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এমতাবস্থায় যদি কেহ লাভের উদ্দেশ্যে স্বর্ণের এবং রৌপ্যের পরিবর্তে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কারবার খোলে তবে উহারা আবদ্ধ হইয়া পড়িল এবং ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদানের সুবিধার যে উদ্দেশ্যে এই মূল্যবান ধাতু দুইটি সৃষ্টি করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্য রহিত হইয়া গেল। (তাই স্বর্ণ-রৌপ্যের তদ্রূপ কারবার শরীয়তে নিষিদ্ধ হইয়াছে।) সুতরাং শরীয়তের কোন বিধানকে উদ্দেশ্যহীন ও অযৌক্তিক বলিয়া কখনও মনে করা সঙ্গত নহে। বরং ইহার প্রত্যেকটি বিধান যেমন হওয়া উচিত ছিল তদ্রূপই হইয়াছে। তবে কতকগুলি বিষয়ের উদ্দেশ্য এত সূক্ষ্ম যে পয়গম্বরগণ ব্যতীত অন্য উহা বুঝিতে পারে না। আবার কতকগুলি উদ্দেশ্য এমন যে, শ্রেষ্ঠ পরিপক্ক আলিমগণ ব্যতীত অপর লোকে উহা জানিতে পারে না। অপরিপক্ক আলিমগণ পরিপক্ক আলিমগণের অনুসরণ করে এবং তাহারা প্রায় সাধারণ লোকেরই তুল্য।

আলিমগণ ঐসকল বিষয়ের উদ্দেশ্য অবগত হইলে সাধারণ লোকের নিকট যাহা মকরূহ তাহাকে তাঁহারা হারাম বলিয়া মনে করেন। যেমন, এক বুযুর্গ

ভুলক্রমে প্রথমে স্বীয় বাম পদে জুতা পরিধান করিলেন। তৎপর এই ভুল ধরা পড়িলে উহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি কয়েক বস্তা গম গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। সাধারণ লোক বিনা কারণে কোন বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিলে, কেবলার দিকে থুথু ফেলিলে বা বাম হাতে কুরআন শরীফ ধরিলে আমরা তত আপত্তি করি না, যেমন বিশিষ্ট লোকের বেলায় করিয়া থাকি। জনসাধারণের মধ্যে যাহারা এই প্রকার বেআদবী করে সৎস্বভাবে পূর্ণতা লাভ করে নাই বলিয়াই তাহারা তদ্রূপ করিয়া থাকে। কেননা তাহারা প্রায় পশুতুল্য এবং ভালমন্দ ততটা বুঝিতে অক্ষম। আল্লাহ তা'আলার কোন্ কার্যে কি উদ্দেশ্য রহিয়াছে ইহার সূক্ষ্মতত্ত্ব তাহারা বুঝিতে পারে না।

যে-সকল মূর্খ বড় বড় গুনাহ্‌র কাজ করে সামান্য ত্রুটির জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করা বৃথা। যদি কোন মূর্খ ব্যক্তি একজন স্বাধীন লোককে ধরিয়া আনিয়া ঠিক জুম'আর নামাযের আযানের সময় বিক্রয় করে, তবে আযানের সময় বিক্রয় মকরূহ বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া কোন লাভ নাই। কারণ, সেই সময়ে ক্রয়-বিক্রয় মকরূহ হইলেও একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া বিক্রয় করা তদপেক্ষা গুরুতর পাপ। আবার যে ব্যক্তি মসজিদের মেহরাবের মধ্যে পশ্চিম দিকে পিঠ দিয়া পায়খানা করিয়াছে, তাহাকে পশ্চিম দিকে পিঠ দিয়া পায়খানা করিয়াছে বলিয়া তিরস্কার করা বৃথা। কারণ মসজিদে পায়খানা করার পাপ, পশ্চিম দিকে পিঠ করিয়া পায়খানা করার পাপ অপেক্ষা অনেক গুরুতর। এইজন্যই জনসাধারণের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করা হয় এবং তাহাদের উদ্দেশ্যেই প্রকাশ্য ফত্ওয়ার আদেশগুলি নিতান্ত সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পরকালের পথের পথিকের পক্ষে প্রকাশ্য ফতওয়ার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বরং সূক্ষ্মতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করিয়া কাজ করা উচিত। তাহা হইলে ন্যায়বিচার ও জ্ঞানে ফিরিশতাদের প্রায় সমতুল হওয়া যায়। অন্যথায় জনসাধারণের মত কর্তব্য কার্যে শিথিলতা অবলম্বন করিলে মানুষ পশুর শ্রেণীতেই থাকিয়া যায়।

নি'আমতের হাকীকত

হিতাহিত বস্তুর শ্রেণী বিভাগ—মানুষের দিক হইতে চিন্তা করিলে আল্লাহ্‌র সমুদয় সৃষ্ট বস্তু চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। **প্রথম শ্রেণী**—যাহা ইহপরকালে হিতকর; যেমন—ইলম ও সৎস্বভাব। বাস্তবপক্ষে দুনিয়াতে এই দুইটিই সম্পদ। **দ্বিতীয়**

শ্রেণী—যাহা উভয় জগতে অনিষ্টকর; যেমন—মন্দ স্বভাব ও অজ্ঞতা। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুইটিই মানবের বিপদ। **তৃতীয় শ্রেণী**—যাহা ইহকালে আরাম দেয়; কিন্তু পরকালে কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। দুনিয়ার ধনৈশ্বর্যের আধিক্য এবং ইহা উপভোগে মত্ত হওয়া, এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মূর্খগণ এইরূপ ধনৈশ্বর্যের উপভোগকে নি'আমত মনে করে; কিন্তু জ্ঞানী ও আরিফ (চক্ষুষ্মান) ব্যক্তি উহাকে বিপদ জ্ঞান করে। ইহার উদাহরণ ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সম্মুখে বিষমিশ্রিত মধুতুল্য। সেই ব্যক্তি মূর্খ হইলে এই মধুকে বিষমিশ্রিত জ্ঞান না করিয়া লোভনীয় দ্রব্য বলিয়া মনে করিবে; কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাকে বিনাশের কারণ বলিয়া জানিবে। **চতুর্থ শ্রেণী**— যাহা এ-জগতে দুঃখ-কষ্ট প্রদান করে বটে কিন্তু পরকালে ইহার কারণে আরাম ও আনন্দ লাভ হয়। রিয়াযত ও মুজাহাদা অর্থাৎ সদ্‌গুণ অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আরিফগণ উহাকে বুদ্ধিমান রোগীর নিকট তিক্ত ঔষধস্বরূপ নি'আমত বলিয়া মনে করেন; কিন্তু মূর্খেরা উহাকে বিপদ বলিয়া জানে।

মঙ্গলামঙ্গলের পরিচয়—দুনিয়ার অধিকাংশ বস্তুতে মঙ্গল ও অমঙ্গল বিজড়িত রহিয়াছে। কিন্তু যে-বস্তুতে ক্ষতি অপেক্ষা লাভ অধিক, ইহাই নি'আমত (সম্পদ)। এই লাভ বা ক্ষতির অবস্থা লোকের অবস্থা অনুসারে পরিবর্তিত হয়। অভাব মোচনের পরিমিত ধনে ক্ষতি অপেক্ষা অধিক মঙ্গল হইয়া থাকে। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন অধিকাংশ লোকের পক্ষে মঙ্গল অপেক্ষা অধিক অমঙ্গলের কারণ হইয়া পড়ে। অল্প ধনও কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া থাকে।

কেননা, ইহা তাহার মনে লোভ জন্মাইয়া দেয়। সামান্য ধনও তাহার না থাকিলে সে লোভ ও লালসার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। আবার এমন কামিল লোকও আছেন যে, ধনৈশ্বর্যও তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তি অভাবের সময় অভাবগ্রস্তদিগকে স্বীয় ধন বিতরণ করিয়া দিয়া থাকেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, একই বস্তু অবস্থা বিশেষে একজনের জন্য নি'আমত; কিন্তু অপরের জন্য ইহাই বিপদস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

হিতাহিতের মাত্রা—লোকে যে-বস্তুকে হিতকর বলিয়া জানে, ইহা তিন প্রকারের হইতে পারে; যথা—বস্তুটি স্বতই হিতকর অথবা বর্তমানে আনন্দদায়ক কিংবা ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলজনক। আবার যে বস্তুকে লোকে মন্দ জানে তাহারও তিনটি অবস্থা; যথা ঃ— বস্তুটি বর্তমানে অপ্রিয়, ভবিষ্যতে ক্ষতিকর বা ইহা স্বয়ং মন্দ।

যে-বস্তুর মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি অবস্থা একত্রে পাওয়া যায় অর্থাৎ বর্তমানে যাহা আনন্দদায়ক, ভবিষ্যতে হিতকর এবং স্বয়ং বস্তুটি মঙ্গলজনক, তাহাই অবিমিশ্র কল্যাণজনক পদার্থ। এরূপ পদার্থ জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার বিপরীত অজ্ঞানতা অবিমিশ্র মন্দ, ইহা বর্তমানে অপ্রিয়, ভবিষ্যতে ক্ষতিকর এবং স্বয়ং বস্তুটিও মন্দ।

অবগত হও, ইলম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও হিতকর জিনিস আর নাই। তবে যাহার হৃদয়ে কোন প্রকার রোগ নাই, তাহার জন্যই ইল্‌ম সর্বোৎকৃষ্ট। অজ্ঞানতা বর্তমানে কষ্টদায়ক ও অপ্রিয়। কারণ যে-ব্যক্তি কোন বিষয়ে অজ্ঞাত, অথচ সে জানিবার ইচ্ছা করে, এমতাবস্থায় সে স্বীয় অজ্ঞানতার যাতনায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। অজ্ঞানতা অনিষ্টকর। কিন্তু ইহা বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন অনিষ্ট করে না, কেবল অন্তরে কদর্যতা সৃষ্টি করে; অর্থাৎ অজ্ঞানতা হৃদয়ের আকার নিতান্ত কুৎসিত করিয়া তুলে। আর বাহির-শরীরের ক্ষতি অপেক্ষা আত্মার আভ্যন্তরিক ক্ষতি অধিক অনিষ্টকর।

আবার কোন কোন কাজ মঙ্গলজনক; অথচ উহা অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হয়; যেমন সমস্ত হস্ত অকর্মণ্য হইয়া যাওয়ার ভয়ে কেবল পচনশীল ক্ষতযুক্ত আঙ্গুল কাটিয়া ফেলা। এমন কতকগুলি বিষয়ও আছে, যাহা এক হিসাবে মঙ্গলজনক, অথচ অন্য হিসাবে অনিষ্টকর। যেমন, মাল-বোঝাই নৌকা ডুবিবার উপক্রম হইলে জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে মাল বাহির করিয়া নদীতে ফেলিয়া দেওয়া।

আনন্দের শ্রেণী বিভাগ—লোকে সাধারণত বলিয়া থাকে যাহা ভাল লাগে, যাহা হইতে আরাম ও আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই নি'আমত। কিন্তু এ-কথা ঠিক নহে। বরং সুখ ও আনন্দের তিনটি শ্রেণী আছে। **প্রথম শ্রেণী**—এই শ্রেণীর আনন্দ নিতান্ত জঘন্য। পানাহার ও স্ত্রী-সম্ভোগের আনন্দ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অধিকাংশ লোক এই প্রকার কার্যকে আনন্দদায়ক মনে করিয়া উহাতে লিপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা দুনিয়াতে যে সকল কাজ করে তৎসমুদয় কেবল এই শ্রেণীর আনন্দ লাভের জন্যই করিয়া থাকে। এই আনন্দ যে নিতান্ত জঘন্য, ইহার প্রমাণ এই যে, সমস্ত পশুপক্ষী ইতর জন্তুও উহা উপভোগে সমান অধিকারী। বরং এ-বিষয়ে ইতর জন্তু মানুষ অপেক্ষা অধিক বাড়িয়া গিয়াছে। কেননা ইহারা মানুষ অপেক্ষা অধিক আহার ও যৌন-সম্ভোগ করে। এমন কি মাছি পিপীলিকা এবং কীটপতঙ্গও এ-শ্রেণীর আনন্দে মানুষের সমান অধিকারী।

এতএব যে-ব্যক্তি একমাত্র পানাহার ও স্ত্রী-সম্ভোগে নিজকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, সে শুধু নিকৃষ্ট ইতর প্রাণীর ন্যায় নিকৃষ্ট আনন্দ উপভোগের জন্যই বাঁচিয়া থাকে। **দ্বিতীয় শ্রেণী**– অপরের উপর প্রাধান্য ও নেতৃত্বের আনন্দ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উত্তেজনা ও ক্রোধের পরিতৃপ্তিতে এই আনন্দ লাভ হয়। এই প্রকার আনন্দ, পানাহার ও স্ত্রী-সম্ভোগজনিত আনন্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও হীন ও জঘন্য আনন্দের মধ্যে পরিগণিত। কারণ ব্যাঘ্র, ভল্লুক ইত্যাদি হিংস্র জন্তুও এরূপ আনন্দের অধিকারী; ইহাদেরও অপরের উপর প্রাধান্য স্থাপন এবং আক্রমণের লোভ জন্মিয়া থাকে। **তৃতীয় শ্রেণী**—ইল্‌ম ও হিক্‌মত (সূক্ষ্ম তত্ত্ব), আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞান এবং তাঁহার সৃষ্টির বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্যের জ্ঞান লাভজনিত আনন্দ। এই শ্রেণীর আনন্দ উপভোগের অধিকার সাধারণ মানুষের নাই; ফিরিশ্‌তাগণ ইহা উপভোগ করিয়া থাকেন। যে-ব্যক্তি এই শ্রেণীর আনন্দ লাভ করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই তাঁহাকে আনন্দ দিতে পারে না এবং তিনিই কামিল (সিদ্ধপুরুষ)।

যে-ব্যক্তি ইল্‌ম হিক্‌মত, আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞান এবং তাঁহার বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্যের কোনটিতেই আনন্দ পায় না, সে অসম্পূর্ণ ও তাহার হৃদয় কঠিন রোগে আক্রান্ত; সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। অধিকাংশ মুসলমান প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর আনন্দে লিপ্ত; অথচ তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর বস্তুতেও আনন্দ লাভ করে। প্রতিপত্তি লাভের আনন্দ এবং কাম-বাসনা চরিতার্থ করার সুখও তাহারা পাইয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞানের আনন্দ যাহার প্রবল হইয়া উঠে, তাহার অপর সকল প্রকার আনন্দ দুর্বল ও লুপ্ত হইয়া যায়। এরূপ ব্যক্তি কামিল লোকের শ্রেণীর নিকটবর্তী। পক্ষান্তরে উপরিউক্ত প্রথম দুই শ্রেণীর আনন্দ যাহার উপর প্রবল এবং তৃতীয় শ্রেণীর আনন্দ যে অনায়াসে লাভ করিতে পারে না, অথচ শেষোক্ত আনন্দকে প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য সে চেষ্টা না করে, তবে সে-ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণীর নিকটবর্তী। ইহাই পুণ্যের পাল্লা ভারী বা হালকা হওয়ার সারমর্ম।

নি'আমতের শ্রেণীবিভাগ

পরকালের সৌভাগ্য প্রকৃত নি'আমত– প্রকৃত নি'আমত পরকালের সৌভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা অপর নি'আমত লাভের উপকরণ নহে, বরং স্বয়ং মানুষের অভীষ্ঠ বস্তু। ইহার চারিটি ভাগ আছে। **প্রথম**—চিরস্থায়ী

জীবন, যাহার ধ্বংস নাই। **দ্বিতীয়**—অনন্ত সুখ, যাহার মধ্যে সুখ-দুঃখের লেশমাত্র নাই। **তৃতীয়**—ইল্‌ম ও কাশ্‌ফ (দিব্যদৃষ্ট) যাহা মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে একেবারে মুক্ত। **চতুর্থ**—পূর্ণ পরিতৃপ্তি, যাহাতে অভাব ও আকাঙ্ক্ষা নাই। এই চারিটির সারমর্ম হইল সর্বদা আল্লাহ্‌-দর্শনের আনন্দ উপভোগ করা এবং কখনও ইহা হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। ইহাই প্রকৃত নি'আমত।

পার্থিব বস্তু কখন নি'আমত–দুনিয়াতে যে-সকল বস্তুকে নি'আমত জ্ঞান করা হয় তৎসমুদয় আখিরাতের উপরিউক্ত নি'আমত লাভের উপকরণমাত্র। রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– اَلْعَيْشُ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ – অর্থাৎ "পরকারের সুখই প্রকৃত সুখ।" এই বাক্য তিনি একবার অপরিসীম কষ্ট ও কঠিন নিপীড়নে পড়িয়া বলিয়াছিলেন। দুনিয়ার কষ্ট যেন হৃদয়ে তীব্র যাতনা না দেয় এবং মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, এই উদ্দেশ্যেই তখন তিনি উহা বলিয়াছিলেন। আর একবার ঠিক ঐ বাক্য তিনি পরম আনন্দের সময় বিদায় হজ্বে বলিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্ম তখন পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছিল; তিনি উষ্ট্রের উপর উপবিষ্ট ছিলেন; সমস্ত লোকের দৃষ্টি তাঁহার দিকে নিবদ্ধ ছিল এবং লোকে তাঁহার নিকট নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল। ধর্মের পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া তিনি সেই কালেমা উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এবার ইহা বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, দুনিয়ার আনন্দের দিকে যেন মন নিবিষ্ট না হয়। এই সময় এক ব্যক্তি বলিলেন– "হে আল্লাহ্‌, আমি তোমার নিকট পূর্ণ নি'আমত প্রার্থনা করিতেছি।" রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন–"পূর্ণ নি'আমত কাহাকে বলে তুমি জান কি?" সে ব্যক্তি জানে না বলিয়া স্বীকার করিল। তখন হযরত (সা) বলিলেন– "বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাই পূর্ণ নি'আমত।"

বাস্তবপক্ষে দুনিয়ার যে-সকল পদার্থ আখিরাতের সৌভাগ্য লাভের উপায় হয় না সেইগুলি প্রকৃত নি'আমত নহে।

আখিরাতের সৌভাগ্য লাভের উপকরণ–আখিরাতের সৌভাগ্য লাভের উপকরণ ষোলটি। তন্মধ্যে চারিটি মনের সহিত এবং চারিটি শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে; চারিটি শরীরের বাহিরের এবং অবশিষ্ট চারিটি ঐ বারটিকে একত্র সমাবেশ করিয়া থাকে।

মনের সহিত সম্পর্কিত উপকরণ–ইল্‌মে মুকাশাফাহ্‌ (দিব্য দর্শনজ্ঞান), ব্যবহারিক জ্ঞান, পবিত্রতা এবং ন্যায়বিচার, এই চারিটি মনের সহিত সম্পর্কিত। (১) আল্লাহ ও তাঁহার গুণাবলী, ফিরিশ্‌তা এবং পয়গম্বরগণের যথার্থ পরিচয় লাভকে এ-স্থলে ইল্‌মে মুকাশাফাহ্‌ বলা হইল (২) এই গ্রন্থের বিনাশন খণ্ডে ধর্মপথে যে-সকল সংকটময় স্থানের কথা বর্ণিত হইয়াছে; ইবাদত ও ব্যবহার খণ্ডে যে পাথেয়ের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে এবং অত্র পরিত্রাণ খণ্ডে ধর্মপথের মঞ্জিলসমূহ সম্বন্ধে যে-বর্ণনা চলিতেছে, তৎসমুদয় সম্যকরূপে উপলব্ধি করাকেই ব্যবহারিক জ্ঞান বলে। (৩) লোভ-লালসাদি, কুপ্রবৃত্তি ও ক্রোধের শক্তি চূর্ণ করিয়া দেওয়া এবং পূর্ণ সৎস্বভাব অর্জন করার নাম পবিত্রতা। (৪) ন্যায়বিচার একটি লোভ-লালসা কামাদি প্রবৃত্তি ও ক্রোধকে একেবারে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিবে না; কারণ এইরূপ করাও অনিষ্টকর। আবার এই প্রবৃত্তিসমূহের বশীভূত হইয়া সীমা অতিক্রম করিয়া যাইবে না। কেননা প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলে অবশেষে ইহা চরম অবাধ্য হইয়া উঠিবে। বরং সর্বদা সততা ও মিতাচারের তুলাদণ্ডে ওযন করিয়া চলিবে। যেমন আল্লাহ বলেন–

اَلاَّ تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ - وَاَقِيْمُو الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ –

অর্থাৎ "তোমরা যেন পরিমাপ-কার্যে সীমা অতিক্রম না কর এবং ন্যায়ভাবে ওযন ঠিক কর, আর ওযনে কম করিও না।" (সূরা আর রাহমান, রুকূ ১, ২৭ পারা)

শরীরের সহিত সম্পর্কিত উপকরণ– শরীরের সহিত যে চারিটি নি'আমতের সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহাদের সাহায্য ব্যতীত উপরিউক্ত মনের সহিত সম্পর্কিত উকরণসমূহ পূর্ণ হইতে পারে না। শরীরের সহিত সম্পর্কিত উপকরণসমূহ এই—স্বাস্থ্য, বল, সৌন্দর্য এবং দীর্ঘ পরমায়ু। পরকালের সৌভাগ্য অর্জনে স্বাস্থ্য, বল এবং দীর্ঘ পরমায়ুর আবশ্যকতা কাহারও অবিদিত নহে। কারণ, এই তিনটির অভাবে জ্ঞান, সৎকার্য, সৎস্বভাব এবং যে-সকল আন্তরিক গুণের কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু সৌন্দর্য এবং সুগঠনের আবশ্যকতা কম। তথাপি অধিকাংশ স্থলে সুন্দর

লোকের অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে। ধন এবং প্রতিপত্তির প্রভাবে লোকে যেমন অপরের সাহায্য পায়, ভক্তিভাজন সুন্দর আকৃতির প্রভাবেও তদ্রূপ সাহায্য পাওয়া যায়। যাহা দুনিয়ার কাজে সাহায্য করে, তাহা আখিরাতের কাজেও সহায়ক হইয়া থাকে। কারণ, দুনিয়ার অভাব মোচন হইলে লোকে নিরুদ্বিগ্ন হইয়া পরকারের কাজে মনোনিবেশ করিতে পারে। দুনিয়া আখিরাতেরই শস্যক্ষেত্র। আবার বাহিরের সৌন্দর্য আন্তরিক সৎস্বভাবের পরিচায়ক। কেননা, শারীরিক সৌন্দর্য আল্লাহ্-প্রদত্ত জ্যোতি। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহের উপর ইহা চম্‌কিতে থাকে। সাধারণত দেখা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে শারীরিক সৌন্দর্যে সুশোভিত করেন, তিনি তাহার আন্তরিক স্বভাবও সুন্দর করিয়া দিয়া থাকেন। এইজন্যই বুযুর্গগণের উক্তি এই যে, মন্দ লোক স্বীয় কুস্বভাবের তুলনায় কখনই অধিক সুন্দর আকৃতি পাইতে পারে না। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"সুন্দর লোকের নিকট তোমার প্রয়োজনীয় বস্তু চাও।" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন–"কোন স্থানে দূত পাঠাইতে হইলে উত্তম নাম-বিশিষ্ট ও সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট লোক পাঠাও।" ফকীহগণ বলেন– "ইল্‌ম, কুরআন শরীফ পাঠ এবং পরহেযগারী গুণে সকলেই সমান হইলে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সে-ই নামাযের ইমামতির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট।"

জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, এ স্থলে সেই সৌন্দর্যের কথা বলা হইতেছে না যাহা দর্শন করিলে কামভাব উত্তেজিত হইয়া উঠে। কেননা, ইহা রমণীদের গুণবিশেষ। বরং যাহার দেহ উন্নত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সুসমঞ্জস ও সুগঠিত, দেখিলে দর্শকের মনে ভক্তির উদ্রেক হয়, বিরক্তি জন্মে না, এমন লোককেই সুন্দর বলা হইয়াছে।

শরীরের বাহিরের উপকরণ–শরীরের বাহিরে অথচ শরীরের পক্ষে দরকারী চারটি সম্পদ পরকালের সৌভাগ্য অর্জনের উপকরণ। উহা এই– (১) ধন, (২) সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, (৩) স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি এবং (৪) বংশমর্যাদা।

পরকালের কাজে এই কারণে ধনের আবশ্যকতা দেখা দেয় যে, ধনহীন দরিদ্র ব্যক্তিকে জীবিকা অর্জনে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতে হয়। সুতরাং জ্ঞানার্জন ও সৎকার্য সম্পাদনে সে যথেষ্ট সময় পায় না। অতএব অভাব মোচনের উপযোগী ধন ধর্মজীবনের একটি নি'আমত। সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি না থাকিলে সর্বদা লোকচক্ষে হীন ও তুচ্ছ থাকিতে হয় এবং শত্রুর

অনিষ্ট হইতেও নিরাপদে থাকা যায় না। এইজন্যই সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আবশ্যকতা রহিয়াছে। কিন্তু উহাদের আধিক্য বহু আপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"প্রত্যুষে শয্যাত্যগের সময় যদি শরীর সুস্থ, মন ভয়শূন্য এবং সেই দিনের আহারের সংস্থান থাকে, তবে যেন সমস্ত দুনিয়া তাহার হস্তগত হইয়াছে।" কিন্তু সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যতীত এই অবস্থা লাভ করা যায় না। হযরত (সা) আরও বলেন ঃ

نِعْمَ الْعَوْنُ عَلٰى تَقْوَى اللّٰهِ الْمَالُ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র জন্য পরহেযগারীর পথে ধন কি উৎকৃষ্ট সহায়ক।"

স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি লোককে বহু কার্যে ব্যাপৃত হইতে অবসর দিয়া থাকে এবং জীবনে সহায়ক হয়। এইজন্যই পরিবারবর্গকে নি'আমত বলা হইয়াছে। পত্নী পুরুষকে অন্যায় কাম-প্রবৃত্তির আপদ হইতে নির্ভয় করিয়া দেয়। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"নেককার স্ত্রী ধর্মকার্যে পুরুষের বড় সহায়ক হইয়া থাকে।" দুনিয়ার ধনদওলত জমা করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইলে হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু জিজ্ঞাসা করিলেন–"আমরা তবে কোন্ ধন সঞ্চয় করিব?" রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন–"যিকিরকারী রসনা, কৃতজ্ঞ হৃদয় এবং ধর্মপরায়ণা স্ত্রী।"

সুসন্তান দুনিয়াতে মাতাপিতাকে বহু সৎকার্যে সাহায্য করিয়া থাকে এবং মাতাপিতার মৃত্যু হইলে তাঁহাদের পাপ মোচনের জন্য দু'আ করেন। নেককার সন্তানসন্ততি পুরুষের জন্য হস্ত, পদ ও পাখাস্বরূপ। কেননা তাহাদের দ্বারা বহু জরুরী কাজ নির্বাহ হয়। ইহপরকালে এইরূপ উপকৃত হওয়া এক বড় নি'আমত। কিন্তু মাতাপিতা যখন সন্তানসন্ততির আপদ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং তাহাদের জন্য নিজেদের সকল শক্তি দুনিয়া অর্জনে অপচয় না করে, কেবল তখনই সন্তানসন্ততি নি'আমতরূপে পরিগণিত হয়।

বংশমর্যাদাও একটি নি'আমত। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিলে লোকে স্বভাবতই সম্মান প্রদর্শন করে। এই কারণেই সম্মানিত কুরাইশ বংশের জন্য নেতৃত্ব নির্ধারিত ছিল। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"পবিত্র স্থানে বীজ বপন কর এবং অপবিত্র আবর্জনা স্তূপে উদ্ভূত সবুজ

বৃক্ষ পরিত্যাগ কর।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"হে "আল্লাহ্‌র রাসূল, আবর্জনা-স্তূপে উদ্ভূত সবুজ বৃক্ষ কি?" হযরত (সা) উত্তরে বলিলেন–"নিকৃষ্ট বংশসম্ভূতা সুন্দরী নারী।"

উচ্চবংশে এ-স্থলে সাংসারিক ধনৈশ্বর্যবান প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী বড়লোকের বংশকে বুঝাইতেছে না; বরং ধর্মপরায়ণ পরহেযগার লোক ও আলিমগণের বংশকে বুঝাইতেছে। পূর্বপুরুষগণের স্বভাব-চরিত্র সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রবেশ করে এবং মূল ভাল হইলে শাখা-প্রশাখাও ভাল হইয়া থাকে। এইজন্যই ধর্মপরায়ণ লোকের বংশে জন্মলাভও এক বড় নি'আমত। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا – অর্থাৎ "আর তাহাদের উভয়ের পিতা সৎ ছিল।" (সূরা কাহাফ, ১০ রুকূ, ১৬ পারা)

উল্লিখিত উপকরণসমূহকে সমাবেশ করিবার উপকরণ– উল্লিখিত তিন শ্রেণীর বারটি উপকরণ একত্র সমাবেশ করিবার জন্য আরও চারটি উপকরণ আবশ্যক। উহা–(১) সৎপথের সন্ধান (হিদায়েত), (২) সৎপথে চলার উৎসাহ (রুশ্‌দ); (৩) চেষ্টা (তাশদীদ) এবং (৪) সাহায্য (তাঈদ)। এই চারটিকে সমবেতভাবে তাওফীক বলে। উপরিউক্ত বারটি উপকরণ থাকিলেও তাওফীক ব্যতীত কোন ফলই হয় না। এ স্থলে 'তাওফীক' শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌র বিধানের সহিত মানুষের ইচ্ছার মিল হওয়া। (অর্থাৎ মানবের ইচ্ছা ও আল্লাহ্‌র বিধান পরস্পর বিরোধী না হওয়া।) সৎ ও অসৎ উভয়টিতেই আল্লাহ্‌র বিধান ও মানুষের ইচ্ছা মিলিয়া যাইতে পারে, তথাপি ব্যবহারত সৎকার্যে পরস্পরের মিল হওয়াকেই তাওফীক বলে। চারটি বস্তুতে তাওফীক পূর্ণতা লাভ করে। যথা–

(১) হিদায়েত। সকলের জন্যই হিদায়েত নিতান্ত আবশ্যক। পরকালের সৌভাগ্যলোলুপ ব্যক্তিকে সবাগ্রে নিজের গন্তব্যপথের সন্ধান লইতে হইবে। কেননা, সুপথ না চিনিয়া বিপদকে সুপথ বলিয়া মনে করিলে লক্ষ্যস্থলে কখনও পৌঁছা যায় না। কাজেই পথের সন্ধান না পাইলে পাথেয় সংগ্রহ করা বৃথা। এইজন্যই আল্লাহ তা'আলা যে পথের সন্ধান ও পাথেয় দান করিয়াছেন, এই উভয় অনুগ্রহ স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন ঃ

رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى –

অর্থাৎ "তিনিই আমাদের প্রভু যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহাদের স্ব স্ব আকৃতি দান করিয়াছেন, তৎপর সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন।" (সূরা তাহা, ২রুকূ, ১৬ পারা)। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى – অর্থাৎ "তিনিই আল্লাহ যিনি ঠিক ঠিক পরিমাণ অনুযায়ী সব কাজ করিয়াছেন; অনন্তর সৎপথ দেখাইয়াছেন।" (সূরা আ'লা, ১ রুকূ, ৩০ পারা)

হিদায়েতের তিনটি শ্রেণী আছে।

প্রথম শ্রেণী – ভালমন্দের পার্থক্য বুঝিতে পারা। আল্লাহ তা'আলা সকল বুদ্ধিমান লোককেই ভাল-মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা দান করিয়াছেন। কেহ কেহ বুদ্ধিবলে ভালমন্দ চিনিতে পারে; আবার কেহ কেহ-বা পয়গম্বরগণের উপদেশক্রমে ভালমন্দ বুঝিয়া লইতে সমর্থ হয়। এই অর্থেই আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ – "আর আমি তাহাকে দুইটি পথ দেখাইয়াছি।"

অর্থাৎ আমি মানবকে বুদ্ধি দ্বারা ভাল ও মন্দ, এই দুইটি পথ চিনিয়া লইবার ক্ষমতা দান করিয়াছি। (সূরা বালাদ, ১ রুকূ, ৩০ পরা)। কিন্তু নিম্ন আয়াতে বুদ্ধিবলে সৎপথে সন্ধান পাওয়ার কথা বর্ণিত হয় নাই; বরং পয়গম্বরগণের উপদেশক্রমে সৎপথ লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى –

অর্থাৎ "আর যে সামূদ জাতি ছিল, আমি তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলাম। অনন্তর তাহারা পথ পাওয়া অপেক্ষা পথভ্রষ্ট থাকাকে পছন্দ করিল।" "সূরা হামীম সিজদা, ২ রুকূ, ২৪ পারা)

যাহারা পয়গম্বরগণের উপদেশ গ্রহণ করে নাই, তাহারা হিংসা ও অহঙ্কার অথবা সংসারের মোহে মুগ্ধ থাকার কারণেই আলিম ও পয়গম্বরগণের উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করে নাই। অন্যথায় সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সৎপথের সন্ধান লাভে সমর্থ।

দ্বিতীয় শ্রেণী–ইহা বিশেষ হিদায়েত। ধর্ম-বিষয়ে মুজাহাদা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহা ক্রমশ লাভ হয় এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে নিগূঢ় তত্ত্বের পথ মানবের সম্মুখে ক্রমান্বয়ে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। মুজাহাদার (সৎস্বভাব অর্জনের নিমিত্ত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর সাধনার) ফলস্বরূপই এইরূপ হিদায়েত লাভ হইয়া

থাকে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا –

অর্থাৎ "যাহারা আমার রাস্তায় মুজাহাদা করিয়াছে, অবশ্যই আমি তাহাদিগকে হিদায়েত করিব।" (সূরা আন্‌কাবূত, ৭ রুকূ, ২১ পারা) এ-স্থলে আল্লাহ্ এ-কথা বলেন যে, কঠোর পরিশ্রম করিলে তিনি মানুষকে স্বীয় পথ দেখাইয়া থাকেন; ইহা বলেন নাই যে, মানুষ পরিশ্রম না করিলেও তিনি তাহাকে হিদায়েত করিয়া থাকেন। আল্লাহ এই সম্বন্ধে অন্যত্র বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى –

অর্থাৎ "যাহারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হইয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদের হিদায়েত অধিক-মাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।" (সূরা মুহাম্মদ, ২ রুকূ, ২৬ পারা)

তৃতীয় শ্রেণী–এই শ্রেণীর হিদায়েত অতীব অসাধারণ। নবূয়ত ও বিলায়েতের উর্ধ্বজগতে এই হিদায়েতের নূর সৃষ্ট হইয়া থাকে। (অর্থাৎ নবী ও খাস ওলীগণ এই হিদায়েত লাভ করিয়া থাকে।) এই পথ প্রদর্শন স্বয়ং আল্লাহ্‌র দিকে; তাঁহার পথের দিকে নহে। ইহা এমনভাবে হইয়া থাকে যে, নিজে নিজে এতটুকু পৌঁছিবার ক্ষমতা বুদ্ধির নাই। এই প্রকার হিদায়েতই নিছক হিদায়েত, যেমন এই আয়াত হইতে বুঝা যায় ঃ

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى –

অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা), আপনি লোকদিগকে বলিয়া দিন যে, আল্লাহ্‌র হিদায়েতই প্রকৃত হিদায়েত।" (সূরা বাকারাহ, ১৪ রুকূ, ১ পারা) এই হিদায়েতকে আল্লাহ্ জীবন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ

অর্থাৎ "যে-ব্যক্তি মৃত ছিল আমি তাহাকে তৎপর জীবিত করিয়াছি (অর্থাৎ যে পথভ্রষ্ট ছিল আমি তাহাকে হিদায়েত করিয়াছি) এবং তাহার জন্য একটি নূর সৃজন করিয়াছি। ইহার প্রভাবে সে মানুষের মধ্যে চলাফেলা করে।" (সূরা আন্‌'আম, ১৫ রুক, ৮ পারা)

(২) **রুশ্‌দ**। সৎপথের সন্ধান মিলিলে ইহা অবলম্বনে চলার উৎসাহকে রুশ্‌দ বলে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ – অর্থাৎ "অবশ্যই আমি ইব্‌রাহীমকে (আ) প্রথম হইতেই রুশ্‌দ্ (সৎপথে চলিবার উৎসাহ) দান করিয়াছি।" (সূরা আম্বিয়া, ৫ রুকূ, ১৭ পারা) মনে কর, এক বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ধন রক্ষণাবেক্ষণের উপায় শিক্ষা করিল। এমতাবস্থায় সে যদি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও শিক্ষানুযায়ী কাজ না করে তবে তাহার পথপ্রাপ্তির উৎসাহ (রুশ্‌দ) আছে বলিয়া বলা যাইবে না। (ধনের হেফাযতের উপায় জানাকে বলে হিদায়েত, আর সেই উপায় অনুযায়ী ধনের হেফাযত করিবার ইচ্ছাকে বলে রুশ্‌দ।)

(৩) **তাশ্‌দীদ**। মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় শীঘ্র অভিষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শরীর এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে সহজে আনন্দের সহিত সঞ্চালন করাকে তাশ্‌দীদ বলে। সুতরাং মারিফাত (জ্ঞান) হিদায়েতের ফল, ইচ্ছা রুশ্‌দের ফল এবং শক্তি ও অঙ্গাদির সঞ্চালন তাশ্‌দীদের ফল।

(৪) **তাঈদ (সাহায্য)**। গায়েবী (অদৃশ্য) সাহায্যকে তাঈদ বলে। অঙ্গ সঞ্চালনের শক্তিকে প্রকাশ্যভাবে এবং সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে অপ্রকাশ্যভাবে এই সাহায্য পাওয় যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ – অর্থাৎ "তাহাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি সাহায্য করিয়াছি।" (সূরা বাকারাহ্, ১১ রুকূ, ১ পারা)

ইসমত (পাপ হইতে রক্ষা করা) তাঈদের প্রায় সমঅর্থবোধক। মানবের অন্তরে এমন একটি অদৃশ্য শক্তির উদ্ভব হওয়াকে ইস্‌মত বলে যাহা তাহাকে পাপ কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখে। অবশ্য কোথা হইতে এই শক্তি উপস্থিত হয়, তাহা সে ভালরূপে অবগত নহে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ –

অর্থাৎ "অবশ্যই সেই স্ত্রীলোক (জুলাইখা) তাঁহার (হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের) প্রতি মন্দ ইচ্ছা করিয়াছিল এবং তিনিও (হযরত ইউসুফ আ) আল্লাহ্‌র প্রমাণ দেখিতে না পাইলে তাহার দিকে (মন্দ) ইচ্ছা করিতেন। (সূরা ইউসুফ, ৩ রুকূ, ১২ পারা)

উপরিউক্ত ষোল প্রকার সম্পদ পরকালের পাথেয়রূপে পরিগণিত; কিন্তু অন্যের সাহায্য ব্যতীত উহারা কোন হিত সাধন করিতে পারে না। অপরপক্ষে যে সকল বস্তুর সাহায্য আবশ্যক, ইহারাও একাকী সাহায্য করিতে পারে না; ইহাদেরও অপরের সাহায্য আবশ্যক। আবার এই শেষোক্ত বস্তুও অন্য পদার্থের সাহায্য ব্যতীত কোনই সাহায্য দিতে পারে না। এই প্রকারে এক বস্তুর জন্য অপর বস্তুর আবশ্যক। আবার ইহার জন্য অন্য বস্তু। এইরূপে যোগ-সাহায্যের একটি শিকল বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই শিকলের শেষ প্রান্ত অবশেষে ঘুরিয়া আসিয়া আল্লাহ্‌র অসীম কৌশল দর্শনে বিস্ময়াভিভূত ব্যক্তিগণের পথপ্রদর্শক, নিখিল বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী একচ্ছত্র সম্রাট, সকল কারণের আদি কারণ, সর্বব্যাপী আল্লাহ্ তা'আলার উপর গিয়ে পড়ে। যেরূপ কৌশলের সহিত এই আবশ্যকতার শিকল জোড় লাগানো হইয়াছে, উহার ব্যাখ্যা নিতান্ত বিস্তৃত। সুতরাং একটু আভাসমাত্র দিয়াই এ-স্থলে ইহা সমাপ্ত করা হইল।

সম্পদ ও বিপদে কৃতজ্ঞতা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ক্রটির কারণ—দুইটি কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মানুষের ক্রটি হইয়া থাকে।

প্রথম কারণ– আল্লাহ্‌র-প্রদত্ত নি'আমত (সম্পদ) সম্বন্ধে অজ্ঞতা। কেননা, আল্লাহ্‌র নি'আমত অসংখ্য ও অগণিত। যেমন আল্লাহ্ স্বয়ং বলেন ঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا –

অর্থাৎ "যদি আল্লাহ্‌র নি'আমত গণনা করিতে যাও তবে গণিয়া শেষ করিতে পারিবে না।" (সূরা ইব্‌রাহীম, ৫ রুকূ, ১৩ পারা) আল্লাহ্-প্রদত্ত নি'আমতসমূহের মধ্যে যাহা মানবকে আহার্যরূপে দান করা হইয়াছে তাহার কিছু আলোচনা 'ইয়াহ্ইয়াউল্ উলূম' গ্রন্থে করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইবে যে আল্লাহ্‌র সমস্ত নি'আমতের পরিচয় লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে এগুলির আলোচনার স্থান হইবে না।

দ্বিতীয় কারণ— আল্লাহ্‌র যে-সমস্ত নি'আমত সর্বব্যাপী এবং সকলেই অনায়াসে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়া থাকে, তৎসমুদয়কে লোকে নি'আমত বলিয়া মনে করে না এবং তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে না। এই যে বায়ু যাহা জীবাত্মাকে সাহায্য করিতেছে এবং হৃদয়-কোটরে প্রবেশপূর্বক ইহার উষ্ণতার

তেজ খর্ব করিয়া সমতা বিধান করিতেছে, এক মুহূর্তের জন্য যদি তাহার অভাব হয় তবে মানুষ জীবিত থাকিতে পারে না। অথচ মানুষ ইহাকে নি'আমত বলিয়াই মনে করিতেছে না। এইরূপ লক্ষ লক্ষ নি'আমত রহিয়াছে যাহাদিগকে নি'আমত বলিয়া লোকে কল্পনাও করে না। কোন ব্যক্তিকে যদি পূতিগন্ধময় কূপে বা উত্তপ্ত হাম্মামখানায় কিছুক্ষণের জন্য আবদ্ধ রাখা যায় অথবা তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তবেই বায়ু কি অমূল্য পদার্থ, সে বুঝিতে পরিবে। যাহার চক্ষু উঠে নাই বা বিদীর্ণ হয় নাই, সে নীরোগ সুস্থ চক্ষুর শুকরিয়া আদায় করে না। এইরূপ ব্যক্তিকে এমন দাসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে যে, মার খায় নাই। কাজেই সে প্রহারের যন্ত্রণা বুঝিতে পারে না। কেননা, দাসের পৃষ্ঠে চাবুক না পড়িলে সে অবাধ্য ও কর্তব্যকর্মে শিথিল হইয়া পড়ে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায়—আল্লাহ-প্রদত্ত নি'আমতসমূহকে অন্তরের সহিত স্মরণ করাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায়। 'ইয়াহ্ইয়াউল-উলুম' গ্রন্থে কতক নি'আমতের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত চিনিয়া লইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কেবল কামিল লোকদের কাজ। অপূর্ণ ও স্বল্পবুদ্ধি লোকের পক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ঃ– এইরূপ ব্যক্তি প্রত্যহ সরকারী হাসপাতাল, জেলখানা ও কবরস্থানে গমন করিবে। তাহা হইলে বালা-মুসীবতে নিপতিত লোকদের অবস্থা দেখিয়া সে নিজের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মূল্য বুঝিয়া হয়ত আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ব্যাপৃত হইবে। কবরস্থানে যাইয়া মনে করিতে হইবে, মৃত লোকেরা আশা করিতেছে যে, যদি তাহাগিকে একদিনের জন্যও জীবিত করিয়া দুনিয়াতে পাঠানো হইত হবে তাহারা স্ব স্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং ক্ষতিপূরণ করিবার সুযোগ পাইত। অথচ তাহাদিগকে এই অবকাশ দেওয়া হইতেছে না। কিন্তু আমি কি নির্বোধ! জীবনের বহুদিন হাতে পাইয়াও ইহার মূল্য বুঝিতেছি না!

মানুষ বায়ু, সূর্য, চক্ষু ইত্যাদি সর্বজনমূলভ সাধারণ নি'আমতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। বরং কেবল ধন বা যাহা একমাত্র সে নিজে ব্যক্তিগতভাবে উপভোগ করে তাহাকেই নি'আমত বলিয়া মনে করে। ইহা মানবের মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, নি'আমত সর্বব্যাপী সর্বজনসূলভ সাধারণ হওয়ার দরুন নি'আমতের শ্রেণী হইতে বহির্ভূত হয় না।

তৎপর চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, মানুষ যে-সমস্ত নি'আমত ব্যক্তিগতভাবে উপভোগ করে, ইহার সংখ্যাও কম নহে। মানুষ মাত্রেই মনে

করে, তাহার ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর কাহারও নাই এবং তাহার স্বভাবের ন্যায় সৎস্বভাব অপর কেহই লাভ করে নাই। এইজন্যই মানুষ অপরকে নিজের ন্যায় চরিত্রবান ও বুদ্ধিমান মনে করে না। এমতাবস্থায় অপরের দোষ অনুসন্ধানে লিপ্ত না হইয়া স্বীয় বুদ্ধি ও সৎস্বভাবের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই তাহার কর্তব্য। আবার কেহই একেবারে দোষমুক্ত নহে; অপরে না জানিলেও প্রত্যেকেই নিজ নিজ দোষ সম্বন্ধে অবগত আছে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের দোষ গোপন রাখিয়াছেন। আল্লাহ্ যদি মানবের দোষ প্রকাশ করিয়া দিতেন এবং যে সমস্ত মন্দ খেয়াল ও অসৎ চিন্তা তাহার হৃদয়ে উদিত হয়, উহা অপরকে জানিতে দিতেন, তবে অপরিসীম অপমানের কারণ হইত। আল্লাহ তা'আলা যে দোষ-ক্রটি অন্যের চক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, ইহা সকলের জন্যই এক বড় নি'আমত। তজ্জন্য আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা প্রত্যেকেরই কর্তব্য।

যে-সম্পদ পাওয়া যায় নাই, সর্বদা ইহার চিন্তা করা উচিত নহে। নতুবা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। বরং যে-সকল নি'আমত পাওয়ার তোমার কোন অধিকার ছিল না, উহা যে আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহপূর্বক অযাচিতভাবে দান করিয়াছেন তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই তোমার কর্তব্য। এক ব্যক্তি কোন বুযুর্গের নিকট যাইয়া স্বীয় দরিদ্রতা উল্লেখ্য করত দুঃখ প্রকাশ করিল। বুযুর্গ বলিলেন—"দশ হাজার টাকার বিনিময়ে তুমি কি তোমার চক্ষু বিদীর্ণ হইতে দিবে?" সেই ব্যক্তি বলিল"না।" তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার হস্ত, পদ, কর্ণ নষ্ট করিয়া প্রত্যেকের পরিবর্তে দশ হাজার টাকা দিলে তুমি সম্মত আছ কি?" সে উত্তর দিল—"না" তিনি পুনরায় বলিলেন—"তোমার বুদ্ধির বিনিময়ে দশ হাজার টাকা পাইতে চাও কি?" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল—"না।" অবশেষে বুযুর্গ বলিলেন—"তোমার নিকট অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকার ধন ত আছে; এমতাবস্থায় কেন দরিদ্রতার অভিযোগ করিতেছ?"

নিজের অবস্থার বিনিময়ে অপরের অবস্থা গ্রহণ করিতে বলিলে অধিকাংশ লোকেই ইহাতে সম্মত হইবে না। সুতরাং বুঝা যায় যে, একজনকে আল্লাহ্ যে-খাস্ নি'আমত দান করিয়াছেন, অন্যকে তাহা প্রদান করেন নাই। অবস্থা যদি ইহাই হয় তবে সর্বাবস্থায় কৃতজ্ঞ থাকাই আবশ্যক।

বিপদে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ—বিপদাপদেও শুক্র করা উচিত। কারণ, কুফ্র ও গুনাহ ব্যতীত এমন কোন বিপদ নাই যাহা একেবারে মঙ্গলশূন্য। কিন্তু

তুমি ইহা জান না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মঙ্গল সম্বন্ধে উত্তমরূপে অবগত আছে। বিপদাপদে পতিত হইলে পাঁচটি কারণের যে-কোন একটি কারণে তোমাকে অবশ্যই শুক্র করিতে হইবে।

প্রথম কারণ—দুনিয়ার কার্যে বিপদ হইলে ধর্মকার্যে বিপদ হয় নাই বলিয়া শুক্র করা আবশ্যক। এক ব্যক্তি হযরত সহল তস্তরীর (র) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"আমার গৃহে চোর প্রবেশ করত সমস্ত ধন চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"শয়তান তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তোমার ঈমান অপহরণ করিলে তুমি কি করিতে?" (অর্থাৎ তোমার ঈমান যে চুরি করে নাই তজ্জন্য শুক্র কর।)

দ্বিতীয় কারণ—যাহা অপেক্ষা কঠিন বিপদ বা রোগ হইতে পারে না, এমন কোন বিপদ বা রোগ নাই। অতএব কোন বিপদ বা রোগ উপস্থিত হইলে তদপেক্ষা কঠিন বিপদ বা রোগ যে হয় নাই, এইজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। যে-ব্যক্তি হাজার বেত্রাঘাতের উপযুক্ত তাহাকে এক শত বেত্রাঘাত করিয়া মুক্তি দিলে দণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে অবশ্যই কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। এক ব্যক্তি ভুলবশত একজন বুযুর্গের মাথার উপর এক টুকরি ছাই ফেলিয়া দিল। ইহাতে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আমি আগুনের উপযুক্ত ছিলাম। এমতাবস্থায় আমার উপর মাত্র ছাই নিক্ষেপ করা হইয়াছে। ইহা আমার প্রতি অসীম অনুগ্রহ।"

তৃতীয় কারণ—দুনিয়াতে মানুষের উপর যে সকর বিপদাপদ আসে, উহা পরকালের জন্য রাখিয়া দিলে পরে তাহাকে তজ্জন্য নিতান্ত কঠিন আযাব ভোগ করিতে হইত। সুতরাং দুনিয়ার সামান্য বিপদ ভোগ করিয়া আখিরাতের কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তি পাইলে কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"আল্লাহ্ তা'আলা যাহার সহিত দুনিয়াতে কঠোরতা করিয়াছেন, আখিরাতে তাহার প্রতি কঠোরতা করা হইবে না।" বিপদে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। কাজেই মানুষ নিষ্পাপ হইয়া গেলে পরকালে আবার তাহার আযাব কিসের? চিকিৎসক তোমাকে তিক্ত ঔষধ সেবক করাইলে ও তোমাকে অপারেশন করিলে উহাতে কষ্ট হইলেও তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ, এই সামান্য কষ্ট স্বীকারের পরিবর্তে তুমি রোগের ভীষণ কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবে।

চতুর্থ কারণ–মানুষের ভাগ্যে যে-সকল বিপদ আসিবে, উহা সৃষ্টির প্রারম্ভেই অদৃষ্টলিপিতে লিখিত রহিয়াছে। এইগুলি অবশ্যই ঘটিবে। সুতরাং এক একটি বিপদ পার হইতে পারিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। হযরত শায়খ আবূ সাঈদ (র) গর্দভের পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া বলিলেন–"আলহাম্‌দুলিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র)।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"এ-স্থলে আল্লাহ্‌র প্রশংসাসূচক বাক্য বলার কারণ কি?" তিনি বলিলেন–"গর্দভপৃষ্ঠ হইতে পতিত হওয়ার বিপদ আমি পার হইয়া গেলাম" অর্থাৎ আমার ভাগ্যে এই বিপদ লিপিবদ্ধ ছিল এবং ইহা অবশ্যই সংঘটিত হইত। তাই ইহা নির্বিঘ্নে পার হইতে পারিলাম বলিয়া আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিলাম।

পঞ্চম কারণ–ইহকালের বিপদে দ্বিবিধ কারণে পরকালের মঙ্গল হয়। প্রথমত সাংসারিক বিপদের বিনিময়ে যে অসীম সওয়াব পাওয়া যায়, ইহা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয়ত দুনিয়ার মহব্বত সব পাপের মূল। দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলে ইহাই বেহেশ্‌তের ন্যায় মনোরম হইয়া উঠে এবং পরকালকে কারাগার বলিয়া মনে হয়। দুনিয়াতে যাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলা বিপদ চাপাইয়া দিয়াছে, তাহারা সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়ে; দুনিয়াকে কারাগারতুল্য জ্ঞান করে এবং মৃত্যুকেই ইহা হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করে। আবার দুনিয়ার সকল বিপদই আল্লাহ্-প্রদত্ত শাসন ও সতর্ক বাণীস্বরূপ। সন্তানের ত্রুটি দর্শনে পিতা যেমন স্নেহবশত তাহার ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য শাসন করেন এবং বুদ্ধিমান পুত্রও সেই শাসনকে মঙ্গলের হেতু মনে করিয়া পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ্-প্রদত্ত বিপদকেও সেই চক্ষে দেখা কর্তব্য।

বিপদাপদের ফযীলত– হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, তোমরা পানাহারের বস্তু যোগাইয়া যেমন রোগীর তত্ত্বাবধান করিয়া থাক, আল্লাহ্ তা'আলা তদ্রূপ বিপদাপদ দ্বারা স্বীয় বন্ধুগণের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল–"আমার ধন চোরে লইয়া গিয়াছে।" তিনি বলিলেন– "যাহার চুরি হয় না এবং শরীর রোগাক্রান্ত হয় না, তাহার মধ্যে মঙ্গল নাই। আল্লাহ যাহাকে ভালবাসেন, তাহার উপর বিপদ অবতীর্ণ করেন।" অন্যত্র তিনি বলেন যে, মর্যাদার তারতম্যানুসারে বেহেশ্‌তে আসনের বহু শ্রেণীবিভাগ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি এমন উন্নত স্তর আছে যে, মানুষ স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা ততদূর পৌঁছিতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বিপদাপদে নিপতিত করিয়া তাহাকে তদ্রূপ মরতবায় উন্নীত করিয়া লয়।

একবার রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আকাশের দিকে চাহিয়া হাসিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন–"মুমিনের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার বিধান দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি। তাহাকে সম্পদ দিয়াও তিনি সন্তুষ্ট হন এবং ইহাতে তাহারও মঙ্গল হইয়া থাকে, আবার তাহার উপর বিপদ চাপাইয়া দিয়াও তিনি সন্তুষ্ট হন এবং ইহাতেই তাহার মঙ্গলও নিহিত থাকে।" অর্থাৎ মুমিন বিপদে সবর এবং সম্পদে শুক্‌র করে। এই উভয় অবস্থাই তাহার জন্য মঙ্গলজনক।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"সুস্থ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন বিপদগ্রস্ত লোকদের মরতবা দর্শন করিয়া বলিবে–'আহা, আমার শরীরের গোশ্‌ত যদি (দুনিয়াতে) নরুন দ্বারা কাটিয়া ফেলা হইত!" একজন পয়গম্বর (আ) নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ্, তুমি কাফিরদিগকে নি'আমত দান কর এবং মুমিনদের উপর বিপদ অবতীর্ণ কর; ইহার কারণ কি?" উত্তরে আল্লাহ্ বলেন–"মানুষের সম্পদ ও বিপদ সমস্তই আমার। মুমিনের পাপ হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে পাপ হইতে পাক পবিত্র হইয়া সে আমার দর্শন লাভ করুক, ইহাই আমি চাই। সুতরাং দুনিয়াতেই বিপদাপদ দ্বারা তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লইয়া থাকি। আর কাফিরগণ দ্বারাও সৎকর্ম সম্পন্ন হয়। কিন্তু পার্থিক সম্পদ দান করত তাহাদের সেই সৎকর্মের পুরস্কার শোধ করিয়া দিতে চাই। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, (মৃত্যুর পর) তাহারা যখন আমার দরবারে উপস্থিত হইবে। তখন যেন তাহাদের কোন প্রাপ্য না থাকে এবং আমি তাহাদিগকে উত্তমরূপে শাস্তি দিতে পারি।"

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَ بِهٖ – (যে ব্যক্তি মন্দ কার্য করিবে, সে তজ্জন্য প্রতিফল পাইবে) এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, (পাপ করিলেই শাস্তি পাইতে হইবে) আমরা কিরূপে উহা হইতে পরিত্রাণ পাইব?" উত্তরে তিনি বলিলেন–"তোমরা কি পীড়িত ও দুঃখগ্রস্ত হও না? মুমিনের পাপের ইহাই প্রতিফল।" হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের একটি সন্তান প্রাণত্যাগ করিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এমতাবস্থায় দুইজন ফিরিশতা বাদী ও বিবাদীরূপে তাঁহার নিকট আগমন করিল। বাদী এই বলিয়া অভিযোগ করিল যে, আমি ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়াছিলাম। কিন্তু বীজ অংকুরিত হইলে বিবাদী পদদলিত করিয়া উহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বিবাদী উত্তর করিল যে, বাদী ঠিক রাজপথের উপর বীজ বপন করিয়াছিল এবং রাস্তা অতিক্রম করিবার কালে ঐ অংকুরগুলি বাঁচাইয়া বাম

বা ডান পার্শ্ব দিয়া চলিবার উপায় ছিল না। এইজন্য যাতায়াতে অংকুরগুলি পদদলিত হইয়া নষ্ট হইয়াছে। হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম বাদীকে বলিলেন- "তুমি কি জান না যে, লোকে রাস্তা দিয়া চলাফেরা করে? তুমি রাজপথে বীজ বপন করিলে কেন?" বাদী উত্তর দিল- "আপনি কি জানেন না যে, মানুষ মৃত্যুর রাজপথের উপর আছে? আপনি স্বীয় পুত্রের মৃত্যুতে শোকবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন কেন?" ইহা শুনিয়া হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয রাহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় পুত্রের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন-"বৎস, আমার অগ্রে তুমি চলিয়া গেলে আমার পুণ্যের পাল্লাতে তোমাকে পাইব; আর তোমার আগে আমি গেলে তুমি আমাকে তোমার পুণ্যের পাল্লায় পাইবে; কিন্তু তোমাকে আমার পুণ্যের পাল্লায় পাইতে আমি পছন্দ করি।" ইহা শুনিয়া পুত্র বলিলেন-"আব্বাজান, আপনি যাহা পছন্দ করেন, আমিও তাহাই পছন্দ করি।" হযরত ইব্‌নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু স্বীয় কন্যার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বলিলেন-

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - (আমরা আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার নিকটই প্রত্যাবর্তন করিব।) সতর অর্থাৎ যাহা আবৃত করা আবশ্যক তাহা ঢাকা পড়িল, খরচ কমিল এবং নগদ সওয়াব পাওয়া গেল।" তৎপর দাঁড়াইয়া দুই রাক'আত নামায সমাপনপূর্বক বলিলেন- আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ - অর্থাৎ 'তোমরা সবর ও নামায সহকারে সাহায্য প্রার্থনা কর।' আমি এই উভয় কাজই করিলাম।" হযরত হাতেম আসেম (র) বলেন-"কিয়ামত-দিবস আল্লাহ্ চারি দল লোকের সম্মুখে চারিজন মহাপুরুষকে প্রমাণস্বরূপ আনয়ন করিবেন। যথা—ধনীদের সম্মুখে হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামকে; হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে গোলামদের সম্মুখে; হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে দরিদ্রগণের সম্মুখে এবং যাহারা বিপদে সবর করে নাই, তাহাদের সম্মুখে হযরত আইয়ুব আলায়হিস্ সালামকে।"

কৃতজ্ঞতা-জ্ঞান সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাই যথেষ্ট মনে করি।

তৃতীয় অধ্যায়

ভয় ও আশা

ভয় ও আশার আবশ্যকতা- ধর্মপথযাত্রীর জন্য ভয় ও আশা দুইটি ডানাস্বরূপ। এই দুই ডানার সাহায্যে মানুষ সকল প্রশংসনীয় মকামে উপনীত হয়। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের পথে ভীষণ অন্তরায় এবং মারাত্মক বিপদসমাকীর্ণ স্থানসমূহ রহিয়াছে। যে-পর্যন্ত পথিকের অন্তরে অকপট আশার উদ্রেক না হয় এবং আল্লাহ্‌র অনুপত সৌন্দর্য দর্শনের জন্য চক্ষু উদ্‌গ্রীব হইয়া না উঠে, সেই পর্যন্ত সেই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা যায় না। উক্ত পথে বাসনা-কামনা প্রভৃতি নানারূপ কুপ্রবৃত্তি পথিককে দোযখের দিকে টানিতে থাকে। এইগুলি বড় শক্তিশালী ও প্রতারক। ইহাদের ফাঁদ নিতান্ত জটিল এবং দুর্বল মানব ইহাতে সহজেই ধরা পড়ে। যে-পর্যন্ত মানব-হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় প্রবল হইয়া না উঠে, সেই পর্যন্ত কেহই এই ফাঁদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। এইজন্যই ভয় ও আশার ফযীলত এত অধিক। আশা নাকাদড়ির ন্যায়; ইহা মানুষকে সম্মুখের দিকে টানিতে থাকে। আর ভয় চাবুকের ন্যায়; ইহা তাহাকে সম্মুখে পরিচালিত করে।

এ-স্থলে প্রথমে 'আশা' সম্বন্ধে বর্ণিত হইবে; তৎপর 'ভয়' সম্বন্ধে বলা হইবে।

আশার ফযীলত- আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে ইবাদত করা অপেক্ষা তাঁহার অনুগ্রহ ও দয়ার প্রত্যাশায় ইবাদত করা অতি উৎকৃষ্ট। কারণ, আশা হইতে ভালবাসা জন্মে এবং ভালবাসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মকাম আর নাই। অপর পক্ষে ভয় হইতে মনে ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللّٰهِ -

অর্থাৎ "তোমাদের সকলেই যেন আল্লাহ্ সম্বন্ধে উত্তম ধারণা পোষণ করিয়া প্রাণত্যাগ কর।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ বলেন—"বান্দা আমাকে যেমন ধারণা করে, আমি তেমনই (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট যে যেরূপ ব্যবহার পাইবার আশা করে, সে তাহাই পাইবে)। আপনি আমার বান্দাদিগকে জানাইয়া দেন যে, তাহাদের ইচ্ছানুরূপ তাহারা আমার প্রতি ধারণা পোষণ করুক।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাহার মৃত্যুকালে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি নিজের অবস্থা কিরূপ মনে করিতেছ?" সে ব্যক্তি বলিল—"আমি আমার পাপের কারণে ভয় পাইতেছি এবং আল্লাহ্‌র রহমতের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।" হযরত (সা) বলিলেন—"এমন সময়ে যাহার অন্তরে এই দুই বিষয় (অর্থাৎ ভয় ও আশা) একত্র হয়, আল্লাহ্ তাহাকে তাহার ভয়ের ব্যাপারে নিস্কৃতি দান করেন এবং যাহা সে আশা করে তিনি তাহাকে উহা দিয়া থাকেন।"

হযরত ইয়াকুব আলায়হিস সালামের উপর আল্লাহ্ ওহী অবতীর্ণ করিলেন—"তুমি কি জান, ইউসুফকে (আ) কেন তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম? এইজন্য বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলাম যে, তুমি তোমার অন্যান্য পুত্রকে বলিয়াছিলে—'আমার আশঙ্কা হয় যে, ব্যাঘ্র তাহাকে খাইয়া ফেলিতে পারে এবং তোমরা তাহার সম্বন্ধে অসতর্ক থাকিতে পার।' তুমি ব্যাঘ্রের জন্য কেন ভয় করিয়াছিলে এবং আমার (দয়ার) আশা কেন কর নাই? তাহার ভাইদের অসতর্কতার কথা ভাবিয়াছিলে অথচ আমি যে রক্ষা করিব ইহার খেয়াল কর নাই?" হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে পাপাধিক্যের চিন্তায় হতাশ দেখিয়া বলিলেন—"নিরাশ হইও না। আল্লাহ্‌র রহমত তোমার গুনাহ অপেক্ষা অনেক বেশী।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন—"অপর লোককে গুনাহ্ করিতে দেখিয়া তুমি গুনাহ্ পরিত্যাগ কর নাই কেন? আল্লাহ্ তাহাকে বাকশক্তি প্রদান করিলে সে নিবেদন করিবে—'ইয়া আল্লাহ্, আমি লোকদিগকে ভয় করিয়াছি; কিন্তু তোমার রহমতের আশা রাখিতাম।' তখন আল্লাহ্ তাহার উপর দয়া করিবেন।"

একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জানিলে অধিক রোদন করিবে, অল্প হাসিবে এবং নির্জন প্রান্তরে যাইয়া বুকে

কশাঘাত করিয়া চিৎকারপূর্বক ক্রন্দন করিবে।" তৎপর হযরত জিব্‌রাঈল আলায়হিস সালাম অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন—"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ বলিয়া পাঠলেন—"আপনি কেন আমার বান্দাগণকে হতাশ করিতেছেন?" ইহা শুনিয়া হযরত (সা) গৃহের বাহিরে আসিয়া লোকগিকে আল্লাহ্‌র বদান্যতা ও দয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত আশা-উদ্দীপনার বাণী শুনাইলেন। হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামের উপর আল্লাহ্ ওহী অবতীর্ণ করিলেন—"হে দাঊদ, তুমি নিজেও আমাকে ভালবাসিতে থাক এবং লোকদের অন্তরেও আমার ভালবাসা জন্মাইয়া দাও।" তিনি নিবেদন করিলেন—"ইয়া আল্লাহ্, অপরের হৃদয়ে কিরূপে তোমার প্রতি ভালবাসা জন্মাইয়া দিব?" আল্লাহ্ বলিলেন—"আমার দানশীলতা ও করুণা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দাও; কারণ দানশীলতা ও করুণা ব্যতীত তাহারা আমাতে আর কিছুই দেখে নাই।"

একব্যক্তি হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে আক্‌সামকে (র) স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি উত্তরে বলিলেন—"আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে প্রশ্নস্থলে দণ্ডায়মান রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি অমুক কাজ করিয়াছ; অমুক কাজ করিয়াছ।' এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া আমি ভয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং নিবেদন করিলাম—'হে আল্লাহ্, তোমার পক্ষ হইতে আমাকে এইরূপ সংবাদ দেওয়া হয় নাই।' আল্লাহ্ বলিলেন—'কিরূপ সংবাদ প্রদান করা হইয়াছে?' আমি নিবেদন করিলাম—'আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, তুমি বলিয়াছ—'আমার বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা ও আশা পোষণ করে, আমি তাহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহারই করিয়া থাকি।' এই সংবাদ আমি আবদুর রায্‌যাক হইতে, তিনি মু'আম্মার হইতে, তিনি যহ্‌রী হইতে, তিনি আনাস হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে, তিনি জিবরাঈল আলায়হিস সালাম হইতে এবং তিনি তোমা হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। (ইহা শুনিয়া) আমি আশা করিয়াছিলাম যে, তুমি আমার উপর দয়া করিবে।' তৎপর আল্লাহ বলিলেন—'জিব্‌রাঈল সত্য বলিয়াছে, আমার রাসূল সত্য বলিয়াছে; আনাস, যহরী, আবদুর রাযযাক, সকলেই সত্য বলিয়াছে। আমি তোমার উপর দয়া করিলাম।' তৎপর আল্লাহ আমাকে গৌরবের পরিচ্ছদ পরাইয়া দিলেন; বেহেশতের বালকগণ পরিচারকরূপে আমার সম্মুখে ঘুরাফেরা করিতেছে এবং আমি এখন এমন আনন্দে বিভোর আছি যে, ইহা কোন সময় কল্পনাও করিতে পারি নাই।"

হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, বনী ইস্রাঈলের এক ব্যক্তি লোকদিগকে আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ করিয়া দিত। কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ তাহাকে বলিবেন–("তুমি যেমন আমার বান্দাগণকে আমার রহমত হইতে নিরাশ করিতে) তদ্রূপ আমি আজ তোমাকে আমার রহমত হইতে নিরাশ করিতেছি।" হাদীস শরীফে আছে যে. এক ব্যক্তি হাজার বৎসর দোযখের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বলিয়া উঠিবে – يَاحَنَّانُ - يَامَنَّانُ (অর্থাৎ হে দয়ালু, হে করুণাময়) তখন আল্লাহ তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিবার জন্য হযরত জিব্‌রাঈল আলায়হিস সালামকে আদেশ দিবেন। তাহাকে সম্মুখে আনয়ন করা হইলে আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিবেন–"দোযখে তোমার স্থান কিরূপ দেখিলে?" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিবে–"সকল স্থান হইতে নিকৃষ্ট।" তাহাকে পুনরায় দোযখে লইয়া যাইবার আদেশ হইবে। তাহাকে দোযখে লইয়া যাইতে থাকিলে সে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে থাকিবে। এমন সময় আল্লাহ বলিবেন–"হে বান্দা, তুমি কি দেখিতেছ?" সে বলিবে–"আমি ধারণা করিয়াছিলাম যে, তুমি যখন আমাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনাইয়াছ তখন আবার দোযখে নিক্ষেপ করিবে না।" তখন আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশ্‌তে লইয়া যাইবার আদেশ করিবেন। আশার কারণে সে দোযখ হইতে অব্যাহতি পাইবে।

আশার হাকীকত

আশার ত্রিবিধ অবস্থা–ভবিষ্যত মঙ্গল কামনাকে রাযা বা আশা বলে। কিন্তু কোন কোন সময় এই ভবিষ্যত মঙ্গল কামনাতেই মানুষ অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা করে, ধোঁকায় পতিত হয় এবং বোকামিও করিয়া থাকে। নির্বোধ লোকেরা ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারে না এবং সবগুলিকেই আশা বলিয়া মনে করে। অথচ এই ধারণা ঠিক নহে। আশা একটি প্রশংসনীয় গুণ।

ভাল বীজ উপযুক্ত সময়ে উর্বরা ভূমিতে বপন করত কাঁটা ও আগাছা নিড়াইয়া যথাসময়ে পানি সেচনপূর্বক যদি কেহ আল্লাহ্‌র নিকট কামনা করে যে, তিনি গাছগুলিকে পার্থিব ও অপার্থিব সকল আপদ হইতে রক্ষা করিয়া উত্তম ফসল উৎপাদন করিয়া দিবেন, তবে এমন কামনাকে আশা বলে। অপর পক্ষে খারাপ বীজ অকর্ষিত ভূমিতে নিক্ষেপ করত আগাছা না নিড়াইয়া বিনা-সেচনে ফসলের আশা করাকে ধোঁকায় পতিত হওয়া (غرور) ও বোকামি (حماقت) বলে। আবার উত্তম বীজ কর্ষিত ভূমিতে বপনপূর্বক সেচন না করিয়া যদি কামনা করা হয় যে, মেঘ আসিয়া বারি বর্ষণ করিবে, অথচ সেই স্থানে বৃষ্টিপাত অসম্ভব না হইলেও সচরাচর বারি বর্ষণ হয় না এমতাবস্থায় ফসলের আশা করাকে অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা (تمنى) বলে।

তদ্রূপ যে ব্যক্তি খাঁটি ঈমানের বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করত কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ স্বভাবরূপ আগাছাসমূহ হৃদয়ক্ষেত্র হইতে দূর করে এবং ইবাদত দ্বারা ঈমানরূপ বৃক্ষকে সেচনপূর্বক কামনা করিতে থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহপূর্বক ইহাকে সকল আপদ হইতে রক্ষা করিবেন এবং সে নিজেও আমরণ সর্বযত্নে ঈমানের তত্ত্বাবধান করত মৃত্যুকালে বিশুদ্ধ ঈমান লইয়া মরিবার ইচ্ছা রাখে, এইরূপ কামনাকে আশা বলে। এমন আশার নিদর্শন এই–ভবিষ্যতে সৎকর্মে কোনরূপ শৈথিল্য না করা এবং সর্বদা ঈমানের তত্ত্বাবধান করা। কারণ, ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধান পরিত্যাগ করা নৈরাশ্যের নিদর্শন, আশার নিদর্শন নহে। পক্ষান্তরে ঈমানের বীজ বিশুদ্ধ না হইলে বা বিশুদ্ধ হইলেও হৃদয়ক্ষেত্রকে মন্দ স্বভাব হইতে পবিত্র না করিলে এবং ইবাদত দ্বারা ঈমানরূপী বৃক্ষকে সেচন না করিলে আল্লাহ্‌র রহমতের আশা করা বোকামি। ইহা আশা নহে। যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অভিলাষ অনুযায়ী যাহা ইচ্ছা তাহাই করে, অথচ আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখে, সে নির্বোধ।" আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا –

অর্থাৎ "অবশেষে তাহাদের পশ্চাতে মন্দ লোক তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইল, উহারা কিতাবের (তওরাতের) উত্তরাধিকারী হইল। তাহারা (নাজায়েয উপায়ে) এই দুনিয়ার জঘন্য সামগ্রী (ধনসম্পদ) গ্রহণ করে এবং বলিয়া থাকে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে।" (সূরা আ'রাফ, ২১ রুকূ, ৯ পারা।) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এ স্থলে নবীগণের পরবর্তী লোকদের নিন্দা করিতেছেন। তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ইহার অনুশাসন না মানিয়া পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল; অথচ তাহারা বৃথা আশা পোষণ করিতে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

যাহাই হউক, যে সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করা মানুষের ক্ষমতার মধ্যে আছে, তৎসমুদয় পূর্ণভাবে সংগ্রহ করত নিজের কর্তব্য সম্পাদনের পর ফলের কামনা করাকে আশা বলে। পক্ষান্তরে উপকরণ সংগ্রহ না করিয়া বা বৃথা নষ্ট করিয়া ফলের কামনা করাই ধোঁকা খাওয়া ও বোকামি করা। আবার যে-স্থলে উপকরণ একেবারে নষ্টও করা হইল না এবং কাজেও লাগানো হইল না, এমন স্থলে ফলের কামনা করাকে অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা বলে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لَيْسَ الدِّيْنُ بِالتَّمَنِّىْ – অর্থাৎ "অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা করিলেই ধর্ম-কর্ম নিষ্পন্ন হয় না।"

তওবা করিয়া ইহা কবূল হওয়ার আশা করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি তওবা করে নাই, কিন্তু তজ্জন্য দুঃখিত ও বিষণ্ন হইতেছে এবং কামনা করিতেছে যে, আল্লাহ্ তাহাকে তওবা করিবার সুযোগ দিবেন, তবে এমন কামনাকেই আশা বলে। কেননা দুঃখিত ও বিষণ্ন হওয়াই তওবার উপকরণ। অপরপক্ষে গুনাহ্‌র জন্য দুঃখিতও না হইয়া তওবা করিবার আশায় থাকা বোকামি ও ধোঁকা খাওয়া বৈ আর কিছুই নহে। বিনা তওবায় ক্ষমার কামনা করাও তদ্রূপ নির্বুদ্ধিতা। অথচ নির্বোধগণ ইহাকেও আশা বলে। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ ۔ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

অর্থাৎ "বাস্তবপক্ষে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে দেশ ত্যাগ করিয়াছে ও জিহাদ করিয়াছে, তাহারাই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের আশা পোষণ করেন। আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং দয়া করিবেন।" (সূরা বাকারাহ, ২৭ রুকূ, ২ পারা।)

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্‌নে মু'আয (র) বলেন–"যে ব্যক্তি দোযখের বীজ বপন করত বেহেশ্‌ত লাভের আশা করে, পাপকার্য করিয়া নেক্‌কার লোকের মর্যাদা পাইবার বাসনা করে এবং সৎকার্য না করিয়া পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার ন্যায় নির্বোধ আর নাই।" যায়েদ-আল খাইল নামক এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্ যে একজনের মঙ্গল চাহেন এবং অপরের চাহেন না, ইহার নিদর্শন কি?" তিনি বলিলেন–"প্রত্যহ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের সময় তোমার অবস্থা কেমন থাকে?" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল- "আমার এই অবস্থা থাকে যে, আমি সৎকার্য ও সৎলোক ভালবাসি। কোন সৎকার্য সম্মুখে আসিলে শীঘ্র ইহা করিয়া লই এবং ইহার সওয়াবকে ধ্রুব সত্য জ্ঞান করি। আবার কোন সৎকার্য হাতছাড়া হইলে দুঃখিত হই এবং তদ্রূপ কার্যের প্রতীক্ষা করিয়া থাকি।" হযরত (সা) বলিলেন– "আল্লাহ্ যে তোমার মঙ্গল চাহেন, ইহাই তাহার নির্দশন। তিনি তোমার অমঙ্গল চাহিলে তোমাকে মন্দ কার্যে লিপ্ত রাখিতেন এবং দোযখের কোন্ গর্তে ফেলিয়া তোমাকে ধ্বংস করিতেন, ইহার পরওয়াও করিতেন না।"

আশা অর্জনের উপায়

আশা কাহার জন্য হিতকর– দুই প্রকার রোগী ব্যতীত আশারূপ ঔষধের আবশ্যকতা নাই। **প্রথম প্রকার–** যে-ব্যক্তি অত্যধিক পাপের কারণে নিরাশ হইয়া তওবা করে না এবং বলে-"আমি এত অধিক পাপ করিয়াছি যে, আল্লাহ্ আমার তওবা কবূল করিবেন না।" **দ্বিতীয় প্রকার-**যে-ব্যক্তি অত্যধিক রিয়াযত (চরিত্রোন্নতিমূলক কর্ম) এবং ইবাদত-কার্যে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করত নিজেকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই দুই প্রকার রোগীর পক্ষে আশা-বৃদ্ধিকারক ঔষধের প্রয়োজন। পরকাল সম্বন্ধে উদাসীন ও অমনোযোগী লোকের জন্য ইহা ঔষধ নহে, বরং মারাত্মক বিষ।

আশা বৃদ্ধির দ্বিবিধ উপায়–দুই উপায়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের আশা মানব-হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠে।

প্রথম উপায়–বিশ্বজগতের সর্বত্র আল্লাহ্ তা'আলার করুণা অবারিত ধারায় অনবরত বর্ষিত হইতেছে দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ করা। দুনিয়াতে যে সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিতেছে, ভূতলে যত উদ্ভিদ ও জীবজন্তু জন্মিতেছে এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত যত সম্পদ রহিয়াছে, তৎসমুদয়ের সৃষ্টিকৌশলের প্রতি মনোনিবেশ করিলে প্রত্যেক ঘটনা ও প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার এরূপ পূর্ণ অনুগ্রহ, অসীম দান ও অপার বদান্যতা সুস্পষ্ট দেখা যায় যে, তদপেক্ষা অধিক কল্পনা করাও মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে

শুক্রের বর্ণনাকালে ইহা বলা হইয়াছে। মানবদেহের প্রতি লক্ষ্য করিলেও বুঝা যায় যে, তাহার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তিনি সমস্তই পূর্ণমাত্রায় বিশেষ সৌন্দর্যের সহিত পরিপাটি করিয়া দিয়াছেন। যে-পদার্থ না হইলে দেহ-রাজ্যের কাজ চলিতে পারে না, যেমন মস্তক, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি, এরূপ বস্তু তিনি পূর্ণভাবে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া প্রদান করিয়াছেন। তৎপর যে-সকল অঙ্গ দ্বারা মানুষ স্বীয় কার্য সম্পন্ন করে, কিন্তু উহা না হইলেও দেহরক্ষার ব্যাঘাত ঘটিত না, যেমন হস্তপদ ইত্যাদি, এরূপ পদার্থকেও যেমন পারিপাট্যের সহিত সৃষ্টি করা উচিত ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তদ্রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার যে সকল বস্তু মস্তকাদির ন্যায় অত্যাবশ্যকও নহে এবং হস্ত-পদাদির ন্যায় কার্য উদ্ধারেও প্রয়োজন হয় না, যাহা মানবের শোভা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে মাত্র তৎসমুদয়ও তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে পারিপাট্যের সহিত সৃষ্টি করিয়াছে, যথা–ওষ্ঠের লালিত্য ভ্রূযুগলের বক্রতা, চক্ষুর মণির কৃষ্ণতা, পলকের সরলতা প্রভৃতি।

কেবল মানুষের প্রতিই আল্লাহ্ তা'আলা তদ্রূপ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে, বরং সমস্ত জীবজন্তু, কীটপতঙ্গের প্রতিও তিনি সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। মধুমক্ষিকা সৃজনের মধ্যে কেমন সুন্দর শিল্পকৌশল দেখা যাইতেছে। ইহার গঠন কেমন চমৎকার এবং আকার কেমন কার্যোপযোগী। ইহাদিগকে নিজের আবাসগৃহ নির্মাণ বিষয়ে আল্লাহ্ কেমন সুন্দর কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন। ইহারা কি চমৎকার গৃহ নির্মাণ করে এবং ইহাতে কেমন শৃঙ্খলার সহিত মধু সঞ্চয় করে। ইহারা স্বীয় বাদশাহ্র আদেশ কেমন সুন্দররূপে পালন করে এবং বাদশাহ্ ইহাদের উপর কেমন চমৎকারভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে, এ সমস্তই বিস্ময়কর ব্যাপার।

অতএব মানবদেহের ভিতরে ও বাহিরে এবং সমস্ত সৃষ্টজগতে যে সকল করুণাব্যঞ্জক আশ্চর্য কৌশল দেখা যাইতেছে তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার অসীম দয়া হইতে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নাই এবং তাঁহার রাজ্যে অতিরিক্ত ভয়েরও স্থান নাই। বরং ভয় ও আশা দুইটিই সমানভাবে জাগরূক রাখা উচিত। তবে আশা বৃদ্ধি পাওয়া অসঙ্গত নহে।

আবার সর্বাবস্থায় ও সকল সময় আল্লাহ্ তা'আলা মানবের প্রতি যে দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তাহা অনন্ত অসীম। এক বুযুর্গ বলেন–"কুরআন শরীফে ধনের আদান-প্রদান সম্বন্ধে যে আয়াত আছে তদপেক্ষা আশা উদ্দীপক আয়াত

আর নাই। কুরআন শরীফে ইহা একটি সুবৃহৎ আয়াত। ধন হাওলাতস্বরূপ দিলে ইহা কিরূপে নিরাপদে থাকিতে পারে এবং নষ্ট না হয়, এই আয়াতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। (অর্থাৎ সব বিষয়েই আল্লাহ্র অপার রহমতের পরিচয় পাওয়া যায়।) সুতরাং এত অনন্ত অসীম দয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁহার পাপী বান্দাদের পাপ মার্জনার ব্যাপারে কি কমতি করিবেন? তবে তাহারা সকলেই দোযখে যাইবে কেন?"

আল্লাহ্র রহমতের আশা বৃদ্ধি করিবার এক বড় উপায় উপরে বর্ণিত হইল। ইহার উপকারিতা অপরিসীম। কিন্তু যে-সে লোক তদ্রূপ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় উপায়– আল্লাহ্র রহমতের আশা অন্তরে পোষণ করা সম্বন্ধে যে-সকল আয়াত ও হাদীস আছে তৎসমুদয়ের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করা। এইরূপ আয়াত ও হাদীস বহু আছে, এ স্থলে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতেছে আল্লাহ্ বলেনঃ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ – অর্থাৎ "তোমরা কেউই আল্লাহ্র রহ্মত হইতে নিরাশ হইও না।" (সূরা যুমর, ৬ রুকূ, ২৪ পারা।) আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ– وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ – অর্থাৎ "ফিরিশতাগণ তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।" সূরা শূরা, ১ রুকূ, ২৫ পারা।)

তিনি আর বলেন ঃ– ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهٖ عِبَادَهٗ – অর্থাৎ "দোযখ এইজন্য সৃষ্ট করা হইয়াছে যে, কাফিরগণকে ইহাতে নিক্ষেপ করা হইবে এবং মুসলমানদিগকে ইহা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করা হইবে।" (সূরা যুমর, ২ রুকূ, ২৩ পারা।)

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বদা তাঁহার উম্মতের জন্য পাপমুক্তি চাহিতেন। তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া আল্লাহ বলেনঃ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ – অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ (সা) লোকে অত্যাচার (মহাপাপ) করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকেন।" (সূরা রা'দ, ১ রুকূ, ১৩ পারা।)

আল্লাহ আরও বলেন ঃ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى – (এবং সত্বর আল্লাহ্ আপনাকে দান করিবেন, যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন।) এই আয়াত নাযিল হইলে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে (রা) বলিলেন–"আমার উম্মতের একটি লোক দোযখে থাকিলেও আমি সন্তুষ্ট থাকিব না।" পবিত্র কুরআন শরীফে এবংবিধ আরও বহু আয়াত রহিয়াছেন।

আল্লাহ্র রহমতের আশা সম্বন্ধে হাদীস–রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আমার উম্মত আল্লাহ্র রহমতপ্রাপ্ত। তাহাদের (পাপের) শাস্তি দুনিয়াতেই ফিত্না ও ভূমিকম্পে হইয়া যাইবে। কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক মুসলমানের হস্তে এক একজন কাফিরকে অর্পণ করিয়া বলা হইবে–"দোযখ হইতে পরিত্রাণের জন্য সে তোমার বিনিময় স্বরূপ।" তিনি বলেন–"জ্বর দোযখের আঁচ। মুসলমান দোযখের (শাস্তির) এতটুকুই পাইবে।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দু'আ করিতেন–"ইয়া আল্লাহ, আমার উম্মতের হিসাব (বিচার) আমার সহিত একসঙ্গে করিও। তাহা হইলে অপর কোন উম্মত তাহাদের সমান দেখাইবে না।" ইহার উত্তরে আল্লাহ বলেন– "হে মুহাম্মদ (সা), ইহারা আপনার উম্মত; আর আমার বান্দা। আমি তাহাদের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালু। আপনি কিংবা অপর কেহ তাহদিগকে অন্য কোন উম্মতের সমান দেখিতে পাইবে, ইহা আমি চাই না।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আমার জীবন তোমাদের জন্য মঙ্গল এবং আমার মৃত্যুও তোমাদের জন্য মঙ্গল। আমি জীবিত থাকিলে তোমাদিগকে শরীয়তের শিক্ষা দান করিব। আর আমি মরিয়া গেলে তোমাদের কার্যকলাপ আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। যে কার্য সৎ হইবে তজ্জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা ও শুক্‌র করিব; আর মন্দ কার্য দেখিলে আল্লাহ্র নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা চাহিব।" একদা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ يَا كَرِيْمَ الْعَفْوِ – ইহা শুনিয়া হযরত জিব্‌রাঈল আলায়হিস্ সালাম নিবেদন করিলেন– "ইহার অর্থ আপনি জানেন কি? ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা পাপ ক্ষমা করিয়া ইহাকে পুণ্যে পরিবর্তিত করিয়া দেন।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম

বলেন–"বান্দা পাপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ বলেন– হে ফিরিশতাগণ, দেখ, আমার এই বান্দা একটি পাপ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহার একজন প্রভু আছেন, যিনি এই পাপের কারণে তাহাকে শাস্তি দিবেন বা তাহাকে মার্জনা করিবেন। তোমরা সাক্ষী, আমি ক্ষমা করিয়া দিলাম।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ বলেন–"আকাশ ভরিয়া যায় এত পাপ করিয়াও বান্দা যদি মুক্তির আশায় ক্ষমতা প্রার্থনা করে তবুও আমি মাফ করিয়া থাকি। পৃথিবী পরিপূর্ণ হয় এত পাপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আমিও পৃথিবীপূর্ণ দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকি।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– "বান্দা পাপ করার পর ছয় ঘণ্টা অতিবাহিত না হইলে ফিরিশ্‌তা এই পাপ লিপিবদ্ধ করে না। এই সময়ের মধ্যে সেই বান্দা তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সেই পাপ লেখাই হয় না। কিন্তু তওবা না করিয়া সেই ব্যক্তি কোন ইবাদত করিলে ডান পার্শ্বের ফিরিশ্‌তা বাম পার্শ্বের ফিরিশ্‌তাকে বলে–'তুমি ঐ পাপ তাহার আমলনামায় লিখিও না; আমিও ইহার পরিবর্তে একটি সওয়াব লিখিব না।' প্রত্যেক সওয়াবই দশগুণ হয়। কাজেই নয়ভাগ সওয়াব ঐ পাপীর আমলনামায় অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"মানুষ পাপ করিলে ইহা তাহার নামে লিখিত হয়।" এই কথা শুনিয়া এক পল্লীবাসী নিবেদন করিলে–"সেই ব্যক্তি যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে?" হযরত (সা) বলিলেন–"তবে সেই পাপ মুছিয়া ফেলা হয়।" সেই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল–"সে যদি পুনরায় পাপ করে?" তিনি বলিলেন–"তবে পুনরায় পাপ লিখিত হয়।" সেই ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল–সে যদি আবার ক্ষমা চায়?" তিনি বলেন–"আবার মুছিয়া ফেলা হয়।" পরিশেষে সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল–"কতক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ হইয়া থাকে?" তিনি বলিলেন–"যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে। মানুষ যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনায় বিরক্ত না হয়, আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ ক্ষমা করিতে বিরক্ত হয় না।"

তিনি অন্যত্র বলেন–"লোক সৎকার্যের ইচ্ছা করিলে তাহার নামে একটি পুণ্য লিখিত হয়। আর কার্যটি সম্পন্ন করিলে একের পরিবর্তে দশটি পুণ্য তাহার নামে লিখিত হয়। তৎপর উহাকে সাত শত পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পক্ষান্তরে লোকে পাপকার্যের ইচ্ছা করিলে ফিরিশ্‌তা (পাপ) লিপিবদ্ধ করে না।

কার্যটি করিয়া ফেলিলে একটিমাত্র পাপ তাহার নামে লিখিত হয়। আবার ইহাও আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন।"

এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল–"আমি রমযানের রোযা রাখি এবং পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ি। ইহার অতিরিক্ত কোন ইবাদত করি না। আমি ধনবান নহি বলিয়া আমার উপর হজ্ব ফরয নহে। হে আল্লাহ্‌র রাসূল, পরকালে আমি কোথায় থাকিব?" হযরত (সা) হাসিয়া বলিলেন–"তুমি আমার সহিত থাকিবে; তবে শর্ত এই–তুমি যদি কপটতা ও ঈর্ষা হইতে নিজকে বাঁচাইয়া রাখ, গায়র মুহার্‌রামের প্রতি দৃষ্টিপাত না কর, অপরকে ঘৃণার চক্ষে না দেখ এবং গীবত ও মিথ্যা কখন হইতে স্বীয় রসনাকে রক্ষা কর, তবে তুমি আমার সঙ্গে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে এবং আমি তোমাকে স্নেহের সহিত আমার এই হাতের তালুতে রাখিব।"

এক পল্লীবাসী রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিলেন–"কিয়ামত দিবস সৃষ্টের বিচার কে করিবেন?" হযরত (সা) বলিলেন–"আল্লাহ্ তা'আলা।" সেই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল–"আল্লাহ্ কি নিজেই বিচার করিবেন?" হযরত (সা) উত্তর দিলেন –"হাঁ।" ইহা শুনিয়া সেই পল্লীবাসী হাসিয়া উঠিল। হযরত (সা) বলিলেন–"তুমি হাসিতেছ?" সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার হাসির কারণ এই যে, দয়ালু প্রভু অধিকার পাইলে অপরাধ মাফ করিয়া দিয়া থাকেন এবং বিচার করিলে কঠোরতা করেন না?।" হযরত (সা) বলিলেন–"এই পল্লীবাসী সত্য বলিয়াছে–আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায় দয়ালু আর কেহই নাই।" হযরত (সা) আবার বলিলেন–"এই পল্লীবাসী ফিকাহ্ শাস্ত্রাভিজ্ঞ।" তিনি পুনরায় বলিলেন–"আল্লাহ্ কা'বাকে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত করিয়াছেন। কেহ যদি ইহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, পাথরগুলি খসাইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া উহা দগ্ধ করিয়া ফেলে তবুও আল্লাহ্‌র কোন একজন ওলীকে হেয় প্রতিপন্ন করিলে যেরূপ পাপ হয় তদ্রূপ পাপ হয় না।" তৎপর সেই পল্লীবাসী জিজ্ঞাসা করিল–"কোন্ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওলী। হযরত (সা) বলিলেন– "সকল মুসলমানই আল্লাহ্‌র ওলী। হে পল্লীবাসী, তুমি কি শুন নাই যে আল্লাহ বলেন ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ –

অর্থাৎ "যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহ্ তাহাদের ওলী। তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকের দিকে আনয়ন করেন।" সূরা বাকারাহ, ৩৪ রুকূ, ৩ পারা।)

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ বলেন–"লোকে আমা হইতে উপকার পাইবে বলিয়া আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের নিকট হইতে উপকার পাইবার উদ্দেশ্যে আমি তাহাদিগকে সৃজন করি নাই।" তিনি বলেন–"আল্লাহ তা'আলা মানব-সৃষ্টির পূর্বেই নিজের সম্বন্ধে লিখিয়া লইয়াছেন–"আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকিবে।" তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ – (আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপসনার যোগ্য নাই) বলিয়াছে, যে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। অন্তিমকালে এই কলেমা যাহার সর্বশেষ উক্তি হইবে, দোযখের অগ্নি তাহার দিকে দৃকপাতও করিবে না। আর শির্‌ক না করিয়া যে ব্যক্তি পরলোকগমন করিবে, সে কখনও দোযখে প্রবেশ করিবে না।" তিনি বলেন–"তোমরা যদি একেবারে পাপ না কর তবে আল্লাহ্ এমন লোক সৃষ্টি করিবেন যাহারা পাপ করিবে এবং তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। কেননা তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু।" তিনি বলেন–"আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার প্রতি স্নেহময়ী জননী অপেক্ষা অধিক দয়ালু।" তিনি বলেন–"কিয়ামতের দিন আল্লাহ এত দয়া প্রদর্শন করিবেন যে, কেহ ইহা কল্পনাও করিতে পারে না। এমনকি ইহা দেখিয়া শয়তানও তাঁহার রহমত পাইবার আশায় মাথা উত্তোলন করিবে।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহমত একশত ভাগ করিয়া নিরানব্বই ভাগ কিয়ামত দিবসের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন এবং এক ভাগের অধিক এই জগতে প্রকাশ করেন নাই। এই এক ভাগ রহমতের কারণেই সকলের হৃদয় দয়াশীল। সন্তানের উপর জননীর দয়া, বাচ্চার উপর জীবজন্তুর দয়া এই এক ভাগ রহমতের দরুনই হইয়া থাকে। কিয়ামতের দিন এই এক অংশ দয়া ও সেই নিরানব্বই অংশের সহিত একত্র করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের উপর বর্ষণ করিবেন। রহমতের প্রতিটি অংশ পৃথিবী হইতে আকাশের মধ্যবর্তী স্থানের কয়েক গুণ হইবে। সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহার ভাগ্যে ধ্বংস আছে, সেই ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহই সেই দিন বিনষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"যাহারা কবীরা গুনাহ্ করে তাহাদের জন্য আমি আমার শাফা'আত (পাপ মোচনের জন্য অনুরোধ) রাখিয়া দিয়াছি। ইহা পরহেযগার ও আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে রত ব্যক্তিদের জন্য বলিয়া তোমরা মনে করিয়া থাক; কিন্তু ইহা ঠিক নহে। বরং পাপী ও বদকারদের জন্য আমি শাফা'আত করিব।" তিনি বলেন—"কিয়ামতের দিন ঘোষণা করা হইবে—হে উম্মতে মুহাম্মদ (সা), তোমাদের উপর আমার হক মাফ করিয়া দিলাম। এখন তোমাদের একের হক অন্যের উপর রহিয়া গেল। তোমরা পরস্পরকে ক্ষমা করিয়া দিয়া বেহেশ্‌তে চলিয়া যাও।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"আমার উম্মতের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন সমবেত জনমণ্ডলীর সম্মুখে আনয়ন করত পাপ লিপিবদ্ধ নিরানব্বইটি খাতা তাহার নিকট স্থাপন করা হইবে। এক একটি খাতা এত বড় হইবে যে, যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইবে ততদূর পর্যন্ত ইহাই দেখা যাইবে। তৎপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন—'ওহে, এই সকল পাপের কোনটি তুমি অস্বীকার কর কি? বা পাপ লিপিবদ্ধ করিতে ফিরিশ্‌তা কোন অন্যায় ও অতিরিক্ত করিয়াছে কি?' সেই ব্যক্তি নিবেদন করিবে—'ইয়া আল্লাহ্, অস্বীকার করিবার কিছুই নাই এবং ফিরিশ্‌তাও কিছু অতিরিক্ত বা অন্যায়ভাবে লিখে নাই।" আল্লাহ্ আবার জিজ্ঞাসা করিবেন—"তোমার কোন আপত্তি আছে কি?" সে নিবেদন করিবে—"হে আল্লাহ্, কোন আপত্তি নাই।" তখন তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইবে যে, তাহাকে দোযখে যাইতে হইবে। কিন্তু সেই সময় আল্লাহ্ বলিবেন—"হে বান্দা, আমার নিকট তোমার একটি পুণ্য আছে; আমি তোমার প্রতি অবিচার করিব না।" তাহার পর এক টুকরা কাগজ বাহির করা হইবে। ইহাতে লিখিত থাকিবে":

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ –

(আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল।) সেই ব্যক্তি বলিবে—"এত বড় বড় নিরানব্বইটি খাতার বিরুদ্ধে এই সামান্য এক টুকরা কাগজ কি কখনও যথেষ্ট হইবে?" আল্লাহ্ বলিবেন—"হে বান্দা, আমি তোমার প্রতি অবিচার করিব না।" তৎপর ঐ নিরানব্বইটি খাতা এক পাল্লায় রাখা হইবে এবং অপর পাল্লায় সেই কাগজের টুকরা স্থাপন করা হইবে। সেই কাগজের টুকরাখানা সবগুলিকে

হালকা প্রতিপন্ন করত নিজে সর্বাপেক্ষা অধিক ভারী হইয়া পড়িবে। কারণ, তাওহীদের বিরুদ্ধে কোন বস্তুই দাঁড়াইতে পারে না।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—"আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদিগকে আদেশ করিবেন—'যাহার অন্তরে রতি পরিমাণ পুণ্য আছে, তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আন।' তদনুসারে ফিরিশ্‌তাগণ তদ্রূপ বহু লোককে বাহিরে আনয়ন করত নিবেদন করিবে—"এইরূপ লোক আর কেহই দোযখে নাই।" আবার আদেশ হইবে—'যাহার হৃদয়ে অর্ধ রতি পরিমাণ পুণ্য আছে, তাহাকেও বাহির করিয়া আন।' ফিরিশতাগণ বহু লোককে বাহিরে আনিয়া নিবেদন করিবে—"এইরূপ লোক কেহই দোযখে নাই।" তৎপর আদেশ হইবে—"যাহার মনে অণু পরিমাণ পুণ্য আছে তাহাকেও বাহিরে আন।' তদনুসারে বহু লোককে বাহিরে আনিয়া নিবেদন করিবে—'যাহার হৃদয়ে অণু পরিমাণ পুণ্য আছে, এমন কোন লোক এখন আর দোযখে নাই।" তখন আল্লাহ বলিবেন—'পয়গম্বরগণের শাফা'আত, ফিরিশতাগণের শাফা'আত, মুসলমানগণের শাফা'আত সব নিঃশেষ হইয়াছে এবং উহা কবূলও হইয়াছে। এখন আমার পূর্ণ দয়া ব্যতীত আর কিছুই বাকী নাই। ইহার পর আল্লাহ্ স্বীয় করুণার হস্ত বিস্তারপূর্বক দোযখ হইতে এক মুষ্ঠি পরিপূর্ণ এমন লোক বাহির করিয়া আনিবেন যাহারা কখনই অণু পরিমাণ পুণ্যও করে নাই। তাহারা দোযখের অগ্নিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া থাকিবে। তৎপর বেহেশ্‌তের 'হায়াত' নামক নহরে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করা হইবে। পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া তাহারা অবশেষে এই নহর হইতে উঠিয়া আসিবে, যেমন বন্যার পানি হইতে সবুজ তৃণরাজি উদ্‌গত হইয়া থাকে। উজ্জ্বল মুক্তামালা তাহাদের গলায় ঝুলিতে থাকিবে। বেহেশ্‌তবাসিগণ তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিবে এবং বলিবে—'এই সকল লোককে আল্লাহ্ (দোযখ হইতে) মুক্তি দিয়াছেন। তাহারা (দুনিয়াতে) কোন পুণ্যই করে নাই।' তৎপর তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে প্রবেশের আদেশ প্রদানপূর্বক বলা হইবে— (যাও) 'যাহা কিছু দেখিবে সমস্তই তোমাদের জন্য।' তাহারা নিবেদন করিবেন—'ইয়া আল্লাহ্, তুমি আমাদিগকে এমন সম্পদ দান করিয়াছ যাহা অপর কাহাকেও দান কর নাই' আল্লাহ্ বলিবেন—'আমার ধনভাণ্ডারে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নি'আমতসমূহ রহিয়াছে।' তাহারা বলিবে—'উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি হইতে পারে?' আল্লাহ্ বলিবেন—ইহা আমার সন্তুষ্টি (অর্থাৎ) আমি তোমাদের প্রতি এরূপ সন্তুষ্ট